আসহাবে সুফ্ফা

ত্যাগ, ইলম ও ভালোবাসার মহাকাব্য



সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

আসহাবে সুফফা: ত্যাগ, ইলম ও ভালোবাসার মহাকাব্য

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

উৎসর্গ

আমার পরম স্নেহের কন্যা **সৈয়দা মানিতা হাসান**

কপিরাইট নোটিশ

এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক/প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনোভাবে ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি, রেকর্ডিং, স্ক্যানিং কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ, সংরক্ষণ বা পুনঃপ্রকাশ করা যাবে না। তবে শিক্ষা, গবেষণা, সমালোচনা বা অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সীমিত উদ্ধৃতি প্রচলিত কপিরাইট আইনের আওতায় ব্যবহারযোগ্য।

এই গ্রন্থে উল্লেখিত নাম, ট্রেডমার্ক, সেবাচিহ্ন ও লোগো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিজস্ব সম্পত্তি। এগুলো কেবল তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কোনো প্রকার অনুমোদন বা অংশীদারিত্ব নির্দেশ করা হয় না।

অনুমতির জন্য যোগাযোগ

এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, অনুলিপি বা ব্যবহার করতে চাইলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
amiri@drmc.edu.bd

ন্যায্য ব্যবহারের নোটিশ (Fair Use Notice)

এই গ্রন্থে কিছু উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে যেগুলোর জন্য সর্বদা কপিরাইট মালিকের অনুমতি নেওয়া হয়নি। এগুলো সমালোচনা, গবেষণা, শিক্ষা ও অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে **ন্যায্য ব্যবহার (Fair Use)** নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই কপিরাইট মালিকের অনুমতি নিতে হবে।

প্রস্তাবনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমাদের সবার জীবনে কিছু মুহূর্ত আসে, যখন হঠাৎ করেই কোনো একটি ইতিহাস, একটি ঘটনা বা একটি চরিত্র এত গভীরভাবে হৃদয়ে আঘাত করে যে, আমরা থমকে দাঁড়াই। আমরা ভাবি এই মানুষগুলোর কথা কেন এতদিন আমরা শুনিনি? তাদের জীবন থেকে কেন আমরা শিক্ষা নিইনি? এই বইটি ঠিক তেমনই এক মুহূর্তের ফসল। এটি কোনো পেশাদারি গবেষণার ফসল নয়; বরং এটি এক আর্তির, এক ভালোবাসার, এবং এক আত্মিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ।

বছর কয়েক আগের কথা। আমি একটি আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি আমার ছিল গভীর আগ্রহ, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যান্ত্রিকতা ও বাণিজ্যিকীকরণ আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছিল। ডিগ্রি অর্জন করতে গিয়ে আমরা যেন জ্ঞানের স্বাদ ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময়ে, হঠাৎ একদিন আমি একটি কিতাবে 'আসহাবে সুফফা' সম্পর্কে পড়ছিলাম। মসজিদে নববীর পাশে খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া একটি মাটির মঞ্চ, যেখানে একদল তরুণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সব কষ্ট সহ্য করে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন ও রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন এই চিত্রটি আমার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিয়েছিল। আমি বারবার ভেবেছি, যেখানে আজ আমরা এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েও জ্ঞানের প্রতি উদাসীন, সেখানে তারা না খেয়ে, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থেকেও জ্ঞানের গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন কী করে? এই প্রশ্নই আমাকে তাদের জীবন নিয়ে পড়তে, গবেষণা করতে এবং অবশেষে এই বইটি লেখার পথে ঠেলে দিয়েছে।

এই বইটি কোনো ঘটনাপঞ্জির শুষ্ক দলিল নয়। এটি আমার ও পাঠকের সাথে এক আত্মিক কথোপকথন। ইতিহাস, হাদিস, তাফসীর ও সমাজতত্ত্বের সমন্বয়ে আমি চেষ্টা করেছি আসহাবে সুফফার জীবনাদর্শের এমন একটি চিত্র আঁকতে, যা কেবল আমাদের জ্ঞানই বৃদ্ধি করবে না; বরং আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করবে। আমি কল্পনা করেছি, একজন পাঠক যখন এই বইটি পড়বেন, তিনি যেন নিজেকে মসজিদে নববীর সেই

চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা এক তরুণ শিক্ষার্থী হিসেবে অনুভব করেন। তিনি যেন আবু হুরায়রা (রা.)-এর পেটে পাথর বাঁধার কষ্ট, বিলাল (রা.)-এর 'আহাদ আহাদ' ধ্বনির প্রশান্তি, এবং সালমান ফারসি (রা.)-এর সত্যের সন্ধানের পথপরিক্রমা নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পান।

এই বইটি লেখার পথটা সহজ ছিল না। হাজার হাজার পৃষ্ঠার পুরনো আরবি ইতিহাস, জীর্ণ হাদিসের গ্রন্থ, এবং আধুনিক গবেষণা প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। তবে প্রতিটি বাধায় আমি আসহাবে সুফফার জীবনের দিকে তাকিয়ে শক্তি পেয়েছি। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মনে হয়েছে, তারা তো না খেয়ে থেকেছেন, অথচ আমি তো পরিপূর্ণ পেটে বসে লিখছি তাহলে আমার ক্লান্তি কীসের? এই অনুভূতি বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে এক অদৃশ্য প্রাণ সঞ্চার করেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই সেইসব মহামানব ইমাম ও মুহাদ্দিসদের প্রতি ইমাম সুয়ুতি, হাফেজ আবু নুআইম, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি যাঁরা শত শত বছর আগে পরিশ্রম করে আসহাবে সুফফার জীবনীগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের কারণেই আজ আমরা এই অমূল্য রত্নের সন্ধান পাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের প্রতি, যারা বইটি লেখার দীর্ঘ সময়ে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা ও প্রেরণা দিয়েছে।

এই বইটি বিশেষভাবে উৎসর্গ করছি আজকের সেই তরুণ-তরুণীদের প্রতি, যারা জ্ঞানের পথে হাঁটতে চায়, কিন্তু পার্থিব চাকচিক্য ও অর্থনৈতিক চাপ তাদের স্বপ্নকে থমকে দিচ্ছে। আমি তাদের বলতে চাই তোমাদের জন্য ইতিহাসের সেরা মডেল অপেক্ষা করছে। তোমরা একা নও। চৌদ্দ শ বছর আগেও একদল তরুণ ছিল, যারা তোমাদের মতোই স্বপ্ন দেখত, কষ্ট পেত, কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে জ্ঞানের পথে অবিচল থেকেছিল। তারাই আজ ইতিহাসের অমর নক্ষত্র। তোমরাও পারবে।

সবশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। যদি এই বইটি পড়ে একজন মানুষও তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে প্রকৃত জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধির পথে পা বাড়ান, তবেই আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আসহাবে সুফফার ভালোবাসা, ত্যাগ ও জ্ঞানের চেতনা ধারণ করার তাওফিক দিন। আমীন।

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ, ওয়া রিজকান তইয়্যিবা, ওয়া আমালাম মুতাকাব্বালা।
(হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।)

লেখক

সূচীপত্র

ভূমিকা: কেন আসহাবে সুফফা আমাদের জন্য অনুকরণীয়?

আলোর খোঁজে এক অন্ধকার যুগের গল্প

আমরা এক অদ্ভুত সময়ে বাস করছি। মানব ইতিহাসে কখনো এত প্রাচুর্য ছিল না, অথচ কখনো এত হাহাকারও ছিল না। আমরা জ্ঞানের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত, অথচ প্রজ্ঞার এক ফোঁটা পানির জন্য তৃষ্ণার্ত। আমাদের হাতে পুরো পৃথিবীর তথ্য ভাণ্ডার একটি স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বন্দী কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা এক গভীর শূন্যতার কারাগারে বন্দী। এই যে পরস্পরবিরোধী বাস্তবতা, এই যে অসংগতির ট্র্যাজেডি, এটাই হয়তো আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সংকট। আর এই সংকটের গভীরে গেলে আমরা দেখতে পাই এক ত্রিমুখী বিপর্যয় শিক্ষার বিপর্যয়, আত্মার বিপর্যয় এবং সম্প্রদায়ের বিপর্যয়। শিক্ষা হারিয়েছে তার পবিত্র লক্ষ্য, আত্মা হারিয়েছে তার প্রশান্তি, আর মানুষ হারিয়েছে মানুষের জন্য ভালোবাসা। ঠিক এই মোড়ে, ইতিহাসের এক কোণ থেকে ভেসে আসে এক বিস্মৃত অধ্যায়ের গন্ধ মদিনার মসজিদে নববীর পাশে একটি ছোট্ট মাচা, একটি ছাউনি দেওয়া মঞ্চ, যার নাম 'সুফফা'। সেখানে বসবাস করতেন একদল মানুষ, যাঁরা ছিলেন জগতের ইতিহাসে এক অনন্য প্রতিকৃতি। ইতিহাস তাদের নাম রেখেছে 'আসহাবে সুফফা' সুফফার অধিবাসী। চৌদ্দ শ বছর আগের সেই মানুষগুলো আজ আমাদের জন্য শুধু বিস্ময়ের বস্তু নন, তাঁরা আমাদের জন্য এক জীবন্ত মডেল, এক আলোকবর্তিকা। কিন্তু কেন? কেন আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে, আমরা সেই ছেঁড়া কাপড় পরা, ক্ষুধার্ত একদল মানুষকে অনুকরণীয় ভাবব? এই প্রশ্নের উত্তরই আমাদের ভূমিকার মূল প্রতিপাদ্য।

আধুনিক শিক্ষার সংকট: ডিগ্রির পাহাড়, জ্ঞানের খরা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে তার প্রকৃতির এক মৌলিক পরিবর্তন। শিক্ষা আজ আর সত্যের সন্ধান নয়, আত্মার বিকাশ নয়; শিক্ষা আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে। একটি শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে যায়, তাকে শেখানো হয় কীভাবে পরীক্ষায় ভালো করতে হয়, কীভাবে একটি ভালো চাকরি পেতে হয়,

কীভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হয়। আমরা তাকে শেখাই কীভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয়, কিন্তু শেখাই না কীভাবে জীবন উপভোগ করতে হয়। আমরা তাকে দিই তথ্যের পাহাড়, কিন্তু দিই না বোধের ছিটেফোঁটা। এই যে শিক্ষা, যার লক্ষ্য কেবল পেশাদারি সাফল্য ও বাজারমূল্য, তা কি প্রকৃত শিক্ষা? আধুনিক সভ্যতার এই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতাটি হলো, আমরা জ্ঞানকে প্রজ্ঞা থেকে, তথ্যকে রূপান্তর থেকে, এবং ডিগ্রিকে চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি।

ইতিহাসবিদ ও শিক্ষা দার্শনিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শিক্ষা যখন কেবল পেশার জন্য হয়, তখন তা সমাজে এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা তৈরি করে। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো যেমন বলেছেন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের কারখানা, যেখানে শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা হয়। আর পাকিস্তানি দার্শনিক সৈয়দ হোসাইন নসর বলেন, "আধুনিক মানুষ জানে কীভাবে জিনিসকে টুকরো টুকরো করতে হয়, কিন্তু জানে না কীভাবে সেগুলোকে আবার এক করতে হয়।" শিক্ষার এই বিচ্ছিন্নতার কারণে আমরা তৈরি করছি দক্ষ প্রকৌশলী, কিন্তু ব্যর্থ মানুষ; তীক্ষ্ণ আইনজীবী, কিন্তু বিবেকহীন নাগরিক; দক্ষ সার্জন, কিন্তু আত্মাহীন সত্তা।

এই সংকটের গভীরতা আরও প্রকট হয় যখন আমরা দেখি জ্ঞানার্জনের পদ্ধতিগত অবক্ষয়। ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যে জ্ঞানার্জনের অর্থ ছিল গুরুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটি জীবন্ত সম্পর্ক। শিক্ষা কেবল কিতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল শিক্ষকের সমগ্র জীবনাচার থেকে অর্জিত একটি অভিজ্ঞতা। একে বলা হয় 'সোহবত' বা সাহচর্য। আধুনিককালে আমরা এই 'সোহবত'-এর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি 'লেকচার', 'অ্যাসাইনমেন্ট' আর 'গ্রেডিং'। অথচ জ্ঞানের গভীরতম স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে আত্মিক সম্পর্ক প্রয়োজন, যে শিক্ষকের চোখে স্বপ্ন দেখা আর গুরুর পদচিহ্ন অনুসরণ করার প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

আত্মশুদ্ধির সংকট: আত্মার মরুভূমিতে বস্তুবাদের উৎসব

দ্বিতীয় যে সংকট আমাদের গ্রাস করেছে, তা হল আত্মার সংকট বা আধ্যাত্মিকতার অবক্ষয়। বাইরে আমরা যতই সমৃদ্ধ হচ্ছি, ভেতরে ততই আমরা দরিদ্র হচ্ছি। এ যেন এক আত্মিক সিজোফ্রেনিয়া। একজন মানুষ পঞ্চাশ তলা বিল্ডিংয়ের ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখে, অথচ তার পা মাটি থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে সে নিজের

সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে ভুলে যায়। একজন সেলিব্রিটি তার পুরো জীবন কাটিয়ে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাখো মানুষের ভালোবাসা কুড়োতে, অথচ তার নিজের ঘরের মানুষটির জন্য তার সময় থাকে না। কেন এমন হয়? কারণ আমরা আত্মার খোরাক জোগাতে ভুলে গেছি। আমরা এতটাই বাহ্যিকতায় মত্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের ভেতরের জগৎ এক অনাদৃত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ইসলামী পরিভাষায় একে বলে 'তাযকিয়াতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধির সংকট। কোরআন বারবার বলেছে, "সেই সফল, যে নিজেকে শুদ্ধ করেছে; এবং সেই ব্যর্থ, যে নিজেকে কলুষিত করেছে" (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, আত্মশুদ্ধি হলো মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি ছাড়া বাহ্যিক সব অর্জনই মূল্যহীন। কিন্তু আধুনিকতা আমাদের শিখিয়েছে এই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে। ভোগবাদ, সেলিব্রিটি কালচার, এবং তাৎক্ষণিক সুখের মনস্তত্ত্ব আমাদের এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে, আমরা আত্মাকে জিজ্ঞাসা করার সময়ই পাই না তুমি কি সুখী? তুমি কি শান্তিতে আছ? তোর কি প্রয়োজন?

সমাজবিজ্ঞানী জিগমুন্ট বাউম্যান আমাদের সময়কে বলেছেন 'লিকুইড মডার্নিটি' এক তরল আধুনিকতা, যেখানে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। সম্পর্ক স্থায়ী নয়, মূল্যবোধ স্থায়ী নয়, এমনকি নিজের পরিচিতিও স্থায়ী নয়। মানুষ নিরন্তর বয়ে চলেছে এক খরস্রোতা নদীর মতো। কিন্তু আত্মা স্থিতি চায়, আত্মা চায় এক স্থায়ী আশ্রয়, এক চিরন্তন সত্যের স্পর্শ। আসহাবে সুফফা ছিলেন এমন এক আত্মিক স্থিতির মূর্ত প্রতীক।

ভ্রাতৃত্বের সংকট: নিঃসঙ্গতার মহামারী

তৃতীয় সংকটটি আগের দুটির চেয়েও ভয়াবহ। তা হল আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভয়াবহ অবক্ষয়। প্রযুক্তি আমাদের একদিকে এনে ফেলেছে একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি, অথচ একই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দূরত্ব করে দিয়েছে গ্রহান্তরের ব্যবধান। আমরা 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর বাসিন্দা হলেও, আমরা নিঃসঙ্গতার মহামারীতে আক্রান্ত। একজন মানুষ ফেসবুকে হাজারো 'ফ্রেন্ড'-এর মাঝে থেকেও নিজেকে একাকী অনুভব করে। টিনএজাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়

অনলাইনে, অথচ তাদের বাস্তব জীবনের সামাজিক দক্ষতা ও সহমর্মিতা ক্রমশ শূন্যের কোঠায় নেমে যাচ্ছে।

এই নিঃসঙ্গতা কেবল একটি অনুভূতি নয়, এটি একটি জনস্বাস্থ্য সংকট। ব্রিটিশ সরকার ২০১৮ সালে 'মিনিস্ট্রি অব লোনলিনেস' নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় খুলতে বাধ্য হয়, কারণ নিঃসঙ্গতা শারীরিক ও মানসিক রোগের মহামারী সৃষ্টি করছে। আমরা এক অদ্ভুত সময়ে বাস করছি যেখানে ধনীরা গরিবদের থেকে বিচ্ছিন্ন, বৃদ্ধরা তরুণদের থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিবেশী প্রতিবেশী থেকে বিচ্ছিন্ন। মানুষ আর মানুষকে বিশ্বাস করে না, পারে না। সবাই এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, যেখানে অন্য মানুষ মানেই প্রতিপক্ষ। এই সংকট কেবল সামাজিক নয়, এটি অস্তিত্বগত।

সুফফা চত্বর: এক চিরন্তন জবাব

ঠিক এই ত্রিমুখী সংকটের মোড়ে দাঁড়িয়ে, ইতিহাসের গভীর থেকে ভেসে আসে আসহাবে সুফফার কাহিনি। এ যেন এক হারানো স্বর্গের গল্প, কিন্তু একই সঙ্গে এ এক বাস্তব ইতিহাস। আমরা যখন আসহাবে সুফফার দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখি শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও ভ্রাতৃত্বের এক অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়। এখানে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। তারা জ্ঞানার্জনের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু তাদের সেই জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রে ছিলেন স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (সা.)। তাদের শিক্ষালয় ছিল মসজিদ, তাদের পাঠ্যবই ছিল কোরআন, এবং তাদের শিক্ষক ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন (সা.)। তারা ডিগ্রির জন্য পড়েননি, তারা পড়েছেন নিজেদের গড়ার জন্য, নিজেদের বদলানোর জন্য।

এই যে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি, এটাই হলো আসহাবে সুফফার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগের ভিত্তি ছিল এই তাওহিদী বা একত্ববাদী জ্ঞানচর্চা, যেখানে জীববিজ্ঞান, জোতির্বিজ্ঞান, ফিকহ, তাসাউফ, অর্থনীতি   সবই একই গাছের বিভিন্ন শাখা। আসহাবে সুফফার জীবনাচার ছিল এই তাওহিদী শিক্ষার জীবন্ত নমুনা। তারা শুধু কোরআনের আয়াত মুখস্থ করতেন না, বরং সেই আয়াত কীভাবে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হয়, তা রাসূলের (সা.) জীবন থেকে প্রত্যক্ষ করতেন। এটা ছিল থিওরি ও প্র্যাকটিসের এক অনবদ্য মেলবন্ধন।

জ্ঞানের জন্য ত্যাগের চরম রূপ

আমরা যখন আসহাবে সুফফার জীবনী অধ্যায়ন করি, তখন আমাদের প্রথমেই আঘাত করে তাদের ত্যাগের মাত্রা। এরা ছিলেন অধিকাংশই তরুণ, অবিবাহিত, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাদের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়, তারা দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করেছিলেন জ্ঞান ও ঈমানের জন্য। বড় বড় ধনী পরিবারের সন্তান, ব্যবসায়ী, কৃষক   যাদের মক্কায় প্রাচুর্য ছিল   তারা সবকিছু ছেড়ে মদিনায় এসেছিলেন, আর থাকার জায়গা না পেয়ে মসজিদের এই ছাউনির নিচে বসবাস করতে থাকেন। মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর জীবন আর মদিনার সুফফা চত্বরের মাটির ওপর শোয়া সেই একই মানুষের জীবনের মাঝে কত বিস্তর পার্থক্য! এই ত্যাগ শুধু অর্থনৈতিক ত্যাগ নয়, এ ছিল নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক বন্ধনের ত্যাগ।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এই আত্মত্যাগীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সূরা বাকারার ২৭৩ নম্বর আয়াতে। এটি একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আয়াত। ইরশাদ হচ্ছে: “দান-সদকা সেইসব অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত যে, তারা জমিনে চলাফেরা করতে পারে না (জীবিকার সন্ধানে)। অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে, কারণ তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না। তুমি তাদের চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দেখে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দার মতো ভিক্ষা করে না। আর তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।” (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

এই আয়াতের শানে নুযুল বা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর (রহ.) ও ইমাম কুরতুবী (রহ.) উল্লেখ করেন, এটি মূলত আসহাবে সুফফা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এটি তাদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্বকে সুস্পষ্ট করে। আয়াতটির গভীরে গেলে আমরা দেখতে পাই তাদের গুণাবলির এক অনন্য বর্ণনা। আল্লাহ বলছেন, “তারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত যে জীবিকার সন্ধানে চলাফেরা করতে পারে না।” এর অর্থ এই নয় যে তারা অলস ছিলেন, বরং জ্ঞানার্জন ও দ্বীনের খেদমতের প্রতি তাদের যে পূর্ণাঙ্গ উৎসর্গীকরণ, তাতে তারা বাইরে গিয়ে উপার্জনের সময় পেতেন না। তাদের জ্ঞানার্জনই ছিল তাদের ফুলটাইম কাজ, তাদের জীবন, তাদের নিঃশ্বাস।

তাফসীরবিদগণ বলেন, “অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে” অর্থাৎ তাদের আত্মসম্মানবোধ এতটাই উচ্চ ছিল, তাদের তওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা এতটাই গভীর ছিল যে, তারা বাহ্যিক আচরণে নিজেদের অভাব প্রকাশ করতেন না। আজকের যুগে যেখানে মানুষ সামান্য প্রয়োজনে চারদিকে হাত পাতে, সেখানে এই শিক্ষা অমূল্য। আর আল্লাহ বলছেন, “তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে” অর্থাৎ তাদের চেহারায়, তাদের আচরণে এক বিশেষ নূর বা জ্যোতি ছিল, যা অভিজ্ঞ চোখ চিনতে ভুল করত না। এই নূর কী? এটা সেই আত্মিক ঔজ্জ্বল্য, যা দীর্ঘ রাতের তাহাজ্জুদ, কোরআন তিলাওয়াত, রাসূলের (সা.) সাহচর্য ও অবিরাম জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। বস্তুবাদী সভ্যতার এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি আমরা এই ‘নূর’ হারিয়ে ফেলেছি, আর তাই চেহারায় আছে ক্লান্তি, কিন্তু নেই প্রশান্তি; আছে বিত্তের জৌলুস, কিন্তু নেই আত্মার দীপ্তি।

শিক্ষা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য সমন্বয়

সুফফা চত্বর শুধু একটি আবাসিক স্থান ছিল না, এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ইকোসিস্টেম। এই শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন স্বয়ং রাসূল (সা.)। তিনি তাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। হাদিস ও ইতিহাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.) এবং উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর মতো জ্ঞানী ব্যক্তিরা এখানে শিক্ষকতা করতেন। এখানে অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে কোরআনের তাজবিদ, ফিকহ, আকাইদ, এমনকি প্রশাসনিক জ্ঞান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) তার গবেষণায় উল্লেখ করেন, এক সময়ে এখানে প্রায় চার শতাধিক সাহাবি অবস্থান করতেন। আরেক ঐতিহাসিক হাফেজ আবু নুআইম (রহ.) তার ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ গ্রন্থে সুফফার স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা সত্তর জন বলে উল্লেখ করেছেন। এই সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, এটি ছিল একটি প্রাণবন্ত ও গতিশীল শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল এসে অবস্থান করত, শিখত এবং আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিত। এটাকে আমরা আজকের ভাষায় ‘ওপেন ইউনিভার্সিটি’ বা

‘উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়’ বলতে পারি, যেখানে ভর্তির একমাত্র যোগ্যতা ছিল জ্ঞানের প্রতি পিপাসা, আর ফি ছিল পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি।

কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিক হলো এর ব্যবহারিক ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা। আসহাবে সুফফা শুধু কিতাবের পাতায় ভ্রাতৃত্বের কথা পড়েননি, তারা তা বাস্তবে বাস করেছেন, প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাতে। সহিহ বুখারির একটি হাদিসে এর চিত্র ফুটে উঠেছে। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, “আসহাবে সুফফা ছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। রাসূল (সা.) সাহাবিদের মধ্যে তাদের ভাগ করে দিতেন এভাবে যে, যার কাছে দুজনের খাবার আছে সে একজনকে এবং যার কাছে তিনজনের খাবার আছে সে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।” (বুখারি)।

বিখ্যাত সাহাবি সাদ ইবনে উবাদা (রা.)-এর মতো ধনী ব্যক্তি একাই আশিজনকে মেহমানদারি করতেন। এটি ছিল সম্পদের এক অনন্য সঞ্চালন, এক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, যা রাষ্ট্র নয়, বরং ব্যক্তি উদ্যোগে ও ঈমানি চেতনায় পরিচালিত হতো। এখানে গরিব ও ধনীর মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল না। ধনী সাহাবিরা এটাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করতেন যে, আল্লাহর রাসূলের (সা.) মেহমানদের খাওয়ানোর সুযোগ তাদের হচ্ছে। অপরদিকে, আসহাবে সুফফার আত্মমর্যাদাবোধ এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা কখনো কারো কাছে হাত পাততেন না, নিজেদের অভাব প্রকাশ করতেন না। তারা সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভরসা করে দিন কাটাতেন।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বিখ্যাত বর্ণনা, “আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, যাদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না।” এই হাদিস শুধু তাদের দারিদ্র্যের চিত্র নয়, বরং তা ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক জ্বলন্ত দলিল। এই মানুষগুলো পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারা দেখিয়েছেন, খাদ্যের অভাবে পেটে পাথর বেঁধেও পবিত্র জ্ঞানচর্চা, আত্মশুদ্ধি ও সমাজ বিনির্মাণে ব্রতী থাকা যায়। তাদের এই কৃচ্ছ্রসাধন আধুনিকতার সেই সব তরুণ-তরুণীদের জন্য এক তীব্র প্রশ্ন, যারা জ্ঞানার্জনের নামে অঢেল বিত্ত খরচ করেও জ্ঞানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে; যাদের আছে জুতার অভাবে শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার গল্প।

ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে সুফফা

আসহাবে সুফফার গুরুত্ব শুধু হাদিস ও তাফসীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আধুনিক ইতিহাসবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকেরাও তাদের স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সিরাত বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ (রহ.) আসহাবে সুফফাকে 'ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই সুফফা চত্বরই ছিল ভবিষ্যতের সেই বিশাল প্রশাসনিক ও জ্ঞানী ক্যাডার তৈরির কারখানা, যারা পরবর্তীতে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিচারক, শিক্ষক, গভর্নর ও সেনাপতি হয়েছিলেন। সত্যিই তো, আমরা যখন দেখি হজরত ওমর (রা.)-এর প্রশাসনিক দক্ষতা, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসের ভাণ্ডার, সালমান ফারসি (রা.)-এর আধ্যাত্মিকতা ও সামরিক কৌশল, আবু দারদা (রা.)-এর প্রজ্ঞা এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে সুফফার এই পাঠশালার ফসল। এটি ছিল এক ধরণের "ক্যাডার কলেজ", কিন্তু গ্লানিমুক্ত, একনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ ত্যাগের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অপর দিকে, সমসাময়িক কিছু গবেষক সুফফা চত্বরকে প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য দার্শনিক গুরুকুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'একাডেমি' ছিল আভিজাত্যের কেন্দ্র, যেখানে শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলোতে বৈরাগ্যের কঠোরতা থাকলেও সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা ছিল। পক্ষান্তরে, আসহাবে সুফফার এই দলটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ছিল একজন আবিসিনিয়ান মুক্তদাস বিলাল (রা.) এবং একজন পারস্যের রাজপরিবারের সন্তান সালমান ফারসি (রা.) কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জ্ঞানার্জন করছেন। এখানে কোনো শ্রেণীভেদ ছিল না, বর্ণভেদ ছিল না, ভাষাভেদ ছিল না। একমাত্র যোগ্যতা ছিল তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, আর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইলমে নবুওয়াত অর্জন করে তা মানবতার সেবায় উৎসর্গ করা। ইসলামী সমতাবাদের এই মর্মকথা এর চেয়ে জীবন্ত উদাহরণ আর কী হতে পারে?

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা ও আত্মজিজ্ঞাসা

এখন প্রশ্ন জাগে, এই যে ইতিহাস, এই যে আদর্শ, তা কি শুধুই গল্প করে শোনানোর জন্য? নাকি আমাদের জীবনে এর কোনো বাস্তব প্রভাব আছে? আধুনিক সমাজতত্ত্ব আমাদের শেখায় যে, একটি সমাজের বিকৃতি তখনই শুরু হয়, যখন তার 'রোল মডেল' বা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বরা ভুল হতে থাকেন। আজকের তরুণ প্রজন্মের সামনে রোল

মডেল হিসেবে যারা আছেন, তারা কি প্রকৃত অর্থে অনুকরণীয়? একজন ইউটিউবার, যার জীবনের লক্ষ্য শুধু ভিউ আর সাবস্ক্রাইবার; একজন সিনেমার নায়ক, যার বাস্তব জীবন নৈতিকতার দৃষ্টিতে দেউলিয়া; একজন ব্যবসায়ী, যার সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি ব্যাংক ব্যালেন্স   এরা কি আমাদের সন্তানদের শেখাতে পারে কীভাবে সত্যিকারের মানবিক হওয়া যায়, কীভাবে আত্মার প্রশান্তি অর্জন করা যায়, কীভাবে সমাজের জন্য কিছু ত্যাগ করা যায়? আসহাবে সুফফা এখানেই আমাদের জন্য এক অনন্য বিকল্প। তারা আমাদের দেখান, দারিদ্র্য যদি হয় জ্ঞান ও ঈমানের পথের কাঁটা, তবুও তা পরম বন্ধু হতে পারে যদি থাকে তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা। তারা আমাদের দেখান, জ্ঞান কখনো পেশার জন্য নয়, বরং জ্ঞান হলো নিজেকে চেনার এবং সৃষ্টির সেবা করার পথ।

ব্যক্তিগত অনুশীলনের (Personal Practice) জন্য আসহাবে সুফফার জীবনাদর্শ থেকে আমরা তিনটি বিষয় গ্রহণ করতে পারি। প্রথমত, 'ইলমের জন্য সময় উৎসর্গ'   আমাদের ব্যস্ত জীবনে এমন কিছু সময় থাকা চাই, যা শুধুই দ্বীনি জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধির জন্য বরাদ্দ, যেখানে চাকরি, ব্যবসা, বা পার্থিব কোনো চিন্তা স্থান পাবে না। দ্বিতীয়ত, 'কৃতজ্ঞতার চর্চা'   আসহাবে সুফফার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল তৃপ্তি। তারা ধনীদের দেখে হিংসা করেননি, বরং আল্লাহর ওই দানের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন যা তাদের দেওয়া হয়েছিল। আমাদের উচিত প্রতিদিন অল্প কিছু সময় হলেও নিজের প্রাপ্তিগুলো নিয়ে ভাবা এবং শোকর গুজারির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। তৃতীয়ত, 'ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন'   আমরা আমাদের বন্ধু বা সহকর্মীদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে নিয়মিত আতিথেয়তা প্রদান, তাদের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, এবং নিজেদের আয়ের একটি অংশ তাদের জন্য ব্যয় করার চর্চা শুরু করতে পারি। এটি শুধু সমাজ বদলাবে না, বরং আমাদের নিজেদের হৃদয়কেও বদলে দেবে।

প্রখ্যাত দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী আলী শরীয়তি তাঁর 'ফাতিমা ইজ ফাতিমা' গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, "যে সভ্যতা তার জ্ঞানী, সংগ্রামী ও ত্যাগী সন্তানদের সম্মানের মঞ্চে বসাতে পারে না, সে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" আসহাবে সুফফা ছিল ইসলামের সেই ত্যাগী সন্তান, যারা পৃথিবীর কোনো বিত্ত-বৈভবের মঞ্চে নয়, বরং

মাটির মঞ্চে বসে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতেন। আর সেই স্বপ্ন ছিল পৃথিবীর বুকে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করা।

বইটির রূপরেখা ও মূল বক্তব্য

এই বইটি কেবল একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়, এটি একটি আর্তি। আমরা চাই, আসহাবে সুফফার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের আয়নার মতো কাজ করুক, যেখানে আমরা নিজেদের দেখতে পাই, নিজেদের ভুলগুলো চিনতে পারি এবং নিজেদের সংশোধনের পথ খুঁজে পাই। বইটি সাজানো হয়েছে পাঁচটি বড় অংশে। প্রথম ভাগে আমরা ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করব, সুফফা চত্বরের স্থাপত্য, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তাদের দারিদ্র্যের স্বরূপ বুঝব। দ্বিতীয় ভাগ হবে পুরোটাই ইলম ও ইবাদতের ওপর, যেখানে আমরা তাদের শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এবং জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করব। তৃতীয় ভাগে ফুটে উঠবে ভালোবাসার কথা রাসূল (সা.) কীভাবে তাদের ভালোবাসতেন, কীভাবে ধনী সাহাবিরা তাদের ভালোবেসে খাওয়াতেন, আর কীভাবে তারা একে অপরকে ভালোবেসে ক্ষুধার কষ্ট ভুলে থাকতেন। চতুর্থ ভাগে আমরা দেখব তাদের কর্মজীবন। কীভাবে এই কাদামাটির মানুষগুলো একদিন প্রদেশের শাসক, যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি ও বিচারালয়ের কাজি হয়েছিলেন। আর পঞ্চম ও শেষ ভাগে আমরা আজকের দিনে তাদের প্রাসঙ্গিকতা, তাদের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি এবং তাদের থেকে আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করব।

প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করেছি কোরআনের আয়াতের তাফসীর, হাদিসের বর্ণনা, ইতিহাসবিদদের বিশ্লেষণ, এবং প্রয়োজনে আধুনিক সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের আলোকে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পাঠকের জন্য থাকবে কিছু আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্ন এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগের জন্য কিছু দিকনির্দেশনা। আমাদের মূল বক্তব্য একটাই: আসহাবে সুফফা নিছক অতীতের গল্প নয়, বরং তাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের নকশা। তাঁদের জীবন থেকে আমরা শিখি, জ্ঞানের আলো কখনো ব্যক্তির একক সম্পদ হয় না, বরং তা হয়ে ওঠে সমগ্র মানবতার জন্য এক মুক্তির দিশা। জ্ঞানের জন্য ত্যাগ, ত্যাগের মাঝে আত্মশুদ্ধি, এবং আত্মশুদ্ধির ফসল

হিসেবে এক সুন্দর ভ্রাতৃত্ববোধ এটাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সিম্ফনি। আসুন, আমরা সবাই মিলে সেই হারানো সিম্ফনি আবার শোনার চেষ্টা করি।

এই বইয়ের প্রতিটি পাতা জুড়ে তাই থাকবে একটি আর্তি, একটি প্রশ্ন আমরা কি তৈরি? আমরা কি আমাদের জীবনের 'সুফফা' তৈরি করতে পারব, যেখানে আমরা নিজেরাও ইলমের পিপাসায় দিন কাটাব, আর পেটে পাথর বেঁধেও বলতে পারব 'আলহামদুলিল্লাহ', আল্লাহ যা দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি কিছু আমাদের প্রয়োজন নেই।

প্রথম পর্ব: ত্যাগ ও ভালোবাসার ভিত্তিপ্রস্তর

(The Foundation of Sacrifice and Love)

ইতিহাসের প্রতিটি মহান কীর্তির পেছনে থাকে ত্যাগ ও ভালোবাসার এক মজবুত ভিত্তি। এই সত্যটি আধ্যাত্মিক জগতে, বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুগের প্রেক্ষাপটে, এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। মদিনার মসজিদে নববীর পাশে একটি ছাউনি দেওয়া মঞ্চ, যেখানে একদল তরুণ পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। এই অংশে আমরা সুফফা গঠনের সেই ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশদভাবে তুলে ধরব, যা ছিল তাদের ত্যাগ ও ভালোবাসার ভিত্তিপ্রস্তর।

অধ্যায় ১: মদিনার মাটিতে রহমতের ছায়া

ইসলামের ইতিহাসে হিজরত শুধু একটি ভৌগোলিক স্থানান্তর ছিল না; এটি ছিল একটি নতুন সভ্যতার, একটি নতুন মূল্যবোধের, এবং একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা বিন্দু। এই নবীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদিনা, আর তার কেন্দ্রস্থল ছিল মসজিদে নববী। আসহাবে সুফফার উত্থান বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে হিজরত-পূর্ব মদিনার সমাজ ব্যবস্থা, মসজিদে নববীর নির্মাণের গুরুত্ব এবং কিবলা পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো কীভাবে একটি পবিত্র মঞ্চের জন্ম দিয়েছিল।

হিজরত-পূর্ব মদিনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র

হিজরতের আগে মদিনা (তৎকালীন ইয়াসরিব) ছিল এক জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নাম। শহরটিতে মূলত তিনটি ইহুদি গোত্র বনু কাইনুকা, বনু নাদির ও বনু কুরাইজা এবং দুটি আরব গোত্র আউস ও খাজরাজ বসবাস করত (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/২৮৬)। এই গোত্রগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে বুয়াসের যুদ্ধের মতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, মদিনার সামাজিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল (তাবারি, ১৯৮৭: ২/৪০৫)। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং নিরাপত্তাহীনতা ছিল নিত্যসঙ্গী।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ইহুদি গোত্রগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে সচ্ছল। তারা কৃষি, বিশেষ করে খেজুর চাষ এবং বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট উল্লেখ করেন যে, মদিনার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল খেজুর উৎপাদন, এবং ইহুদিরা এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত (Watt, ১৯৫৬: ২২)। তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতিও চালু করেছিল, যা আরব গোত্রগুলোর মধ্যে তাদের প্রতি ঘৃণা ও নির্ভরশীলতার একটি কৃত্রিম সম্পর্ক তৈরি করেছিল।

অন্যদিকে, আউস ও খাজরাজ গোত্র ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব এবং ইহুদিদের আধিপত্যের কারণে তারা একটি নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। ঠিক এমনই এক দুঃসময়ে, হজ্জের মৌসুমে কয়েকজন খাজরাজি ব্যক্তি মক্কায় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাক্ষাৎ পান এবং ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হন।

ইসলামের শিক্ষা তাদের কাছে শুধু ধর্মীয় মুক্তিই নয়, বরং একটি সমাধান যুদ্ধ-বিদ্বেষ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং বৈষম্য দূর করার এক বাস্তব নকশা হিসেবে ধরা দিয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ সংঘটিত হয়, যা ছিল মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের সাংবিধানিক দলিল (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/৪৪১)।

মসজিদে নববী নির্মাণ: একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল

রাসূল (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তাঁর উটনী 'কাসওয়া' কুবায় কিছুদিন অবস্থানের পর যেখানে বসে পড়ে, সেখানেই মসজিদে নববী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (বুখারি, হাদীস: ৩৯০৬)। জমিটি ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের দুই ইয়াতিম ছেলে সাহল ও সুহায়লের। রাসূল (সা.) জমিটি ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। এই মসজিদ কেবল ইবাদতের স্থান ছিল না; এটি ছিল নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশাসনিক সদর দপ্তর (আল-বুতি, ২০০১: ১৫৮)।

মসজিদ নির্মাণের কাজে রাসূল (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাহাবিদের সঙ্গে ইট বহন করতেন এবং বলতেন, "হে আল্লাহ! প্রকৃত কল্যাণ হলো আখিরাতের কল্যাণ, তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও" (বুখারি, হাদীস: ৩৯০৭)। এই দৃশ্যে এক বিপ্লবী বার্তা ছিল: রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই; কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা এবং সমাজ গঠনে অংশ নেওয়া ইবাদতেরই অংশ। মসজিদের কাঠামো ছিল অত্যন্ত সাধারণ। এর দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের, ছাদ ছিল খেজুর পাতার, আর খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের।

ইসলামী স্থাপত্যের ইতিহাসবিদ ড. স্পাহিচ ওমর বলেন, "মসজিদে নববী ছিল একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান। এটি একই সঙ্গে একটি প্রার্থনাগার, একটি স্কুল, একটি আদালত, একটি সম্মেলন কেন্দ্র এবং একটি সামাজিক কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত" (Omer, ২০০৯: ১১৮)। এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমেই রাসূল (সা.) একটি 'সিটি-স্টেট' বা নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, যেখানে ধর্ম ও রাজনীতি, ইবাদত ও সমাজনীতি একই সুতোয় গাঁথা ছিল।

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ও সুফফা চত্বরের সৃষ্টির রহস্য

প্রাথমিকভাবে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া হতো বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)-এর দিকে মুখ করে। এই কিবলা ইহুদিদেরও কিবলা হওয়ায়, এটি একটি আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের সেতু হিসেবে কাজ করছিল। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর অন্তরের বাসনা ছিল মক্কার কাবা যেন কিবলা হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর" (সূরা আল-বাকারা: ১৪৪)। এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরিফকে কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয় (মুসলিম, হাদীস: ৫২৬)।

এই কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি সুফফা চত্বরের সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিবলা পরিবর্তনের পর, মসজিদের পূর্ববর্তী উত্তর-পশ্চিম কোণের কিবলা বাতিল হয়ে যায়। মসজিদের দক্ষিণ দিকটি ছিল রাসূল (সা.) ও তাঁর স্ত্রীদের হুজরার জন্য নির্ধারিত (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৩৮)। পূর্বের কিবলার দিকটিতে একটি প্রাচীর তুলে দেওয়া হয় এবং ওই স্থানটি বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইমাম আল-সামহুদি (রহ.) 'ওয়াফা আল-ওয়াফা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এই স্থানটিকেই 'সুফফা' বা 'যুল্লাহ' নামে অভিহিত করা হতো এবং এটি ছিল দরিদ্র, গৃহহীন মুহাজিরদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৪০)।

কিবলা পরিবর্তন ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি নতুন পরিচয়ের ঘোষণা। আর এই পরিচয়ের কেন্দ্রে ছিল মসজিদে নববী। মসজিদের একটি অংশ যখন 'সুফফা' নামে গৃহহীন জ্ঞানপিপাসুদের জন্য উৎসর্গ করা হলো, তখন এটি প্রমাণিত হলো যে, এই নতুন রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি নয়, বরং জ্ঞান ও আত্মার মুক্তিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ড. আকবার শাহ নাজিবাবাদি উল্লেখ করেন, "সুফফা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রথম প্রকাশিক ছবি, যেখানে রাষ্ট্রের সবচেয়ে অভাবী নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আবাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল" (নাজিবাবাদি, ২০০০: ১/২৪৭)।

ধ্যায় ২: সুফফা: একটি স্থাপত্য, একটি আদর্শ

সুফফা কেবল ইট-কাঠের একটি স্থাপনা ছিল না; এটি ছিল একটি জীবন্ত আদর্শের নাম। এর নামকরণ, এর ভৌত কাঠামো এবং সময়ের সাথে এর বিবর্তন আমাদের কাছে সেই ত্যাগ, জ্ঞান ও ভ্রাতৃত্বের গল্প বলে, যা ইসলামের প্রথম যুগকে চিহ্নিত করে।

'সুফফা' ও 'যুল্লাহ' নামকরণের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

'সুফফা' (الصُّفَّة) শব্দটি আরবি ধাতু 'ص ف ف' (সাদ-ফা-ফা) থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো সারিবদ্ধ হওয়া বা স্তূপীকৃত করা। এর থেকে 'সুফফা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় একটি প্রশস্ত মঞ্চ বা বারান্দা, যা সাধারণত বসার বা আশ্রয়ের জন্য ভূমি থেকে কিছুটা উঁচু করে তৈরি করা হয় (ইবনে মানজুর, ১৯৯৩: 'লিসানুল আরব', ৯/১৮০)। ভাষাবিদ আল-ফিরোজাবাদি (রহ.) 'আল-কামুস আল-মুহিত' গ্রন্থে বলেন, "সুফফা হলো বাড়ির সামনের একটি ছাদযুক্ত বারান্দা, যা মেহমানদের বসার জন্য নির্ধারিত" (আল-ফিরোজাবাদি, ২০০৫: ৮০২)।

অন্যদিকে, 'যুল্লাহ' (الظُّلَّة) শব্দটি এসেছে 'ظ ل ل' (যা-লাম-লাম) ধাতু থেকে, যার অর্থ ছায়া প্রদান করা বা ঢেকে ফেলা। 'যুল্লাহ' হলো সেই ছাউনি, যা রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয় (ইবনে মানজুর, ১৯৯৩: ১১/৪০২)। সুফফাকে 'যুল্লাহ' নামেও অভিহিত করার কারণ হলো, রাসূল (সা.)-এর আদেশে এটির ওপর খেজুর পাতার একটি ছাউনি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, যা এর বাসিন্দাদের প্রখর মদিনার রোদ থেকে রক্ষা করত (বুখারি, হাদীস: ৪৪২, পরিচ্ছেদ-৩৬)। ঐতিহাসিকভাবে এই দুই নামের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, সুফফা একটি বহুমুখী স্থাপনা ছিল এটি ছিল উঁচু একটি বসার জায়গা (সুফফা) এবং একই সঙ্গে ছায়াযুক্ত একটি আশ্রয়স্থল (যুল্লাহ)। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে 'সীমান্তবর্তী একটি স্থান' (liminal space) বলা যেতে পারে যা একটি গৃহস্থালির ঘর নয়, আবার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত মাঠও নয়, বরং একটি সুরক্ষিত ও পবিত্র শিক্ষাক্ষেত্র।

সুফফা চত্বরের ভৌত কাঠামো ও সময়ের সাথে তার পরিবর্তন

প্রাথমিক যুগে সুফফার ভৌত কাঠামো ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বিভিন্ন সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থের বিবরণ থেকে আমরা এর একটি আনুমানিক চিত্র পাই। ইবনে সা'দ (রহ.) তার 'আত-তাবাকাত আল-কুবরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সুফফা মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল এবং এটি একটি আচ্ছাদিত মঞ্চ ছিল, যা মূল ভূমি থেকে কিছুটা উঁচু ছিল (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ১/২৫৫)। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১২ মিটার এবং প্রস্থ ছিল প্রায় ৮ মিটার, যদিও এই পরিমাপ সম্প্রসারণের আগের (আল-কাদি, ২০০৭: ১৩৫)।

এর নির্মাণশৈলী ছিল মক্কা থেকে আগত গৃহহীন মুহাজিরদের চাহিদার প্রতিচ্ছবি। এটি ছিল মূলত খেজুর গাছের খুঁটির ওপর স্থাপিত খেজুর পাতার ছাউনি। এর তিন দিক ছিল খোলা, শুধু পশ্চিম দিকটি মসজিদের অভ্যন্তরের দিকে মুখ করা ছিল। এই খোলামেলা নকশা একদিকে যেমন বায়ুচলাচল নিশ্চিত করত, তেমনি এর একটি প্রতীকী তাৎপর্যও ছিল এটি ছিল জ্ঞান গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত; ধুলাবালি ও বৃষ্টির ছাঁট আসা সত্ত্বেও এখানে অবস্থান ছিল দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রতি নিরাসক্তির প্রমাণ (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৪১)।

সময়ের সাথে সাথে সুফফা চত্বরের ভাগ্যেও পরিবর্তন আসে। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে (৮৬-৯৬ হি./৭০৫-৭১৫ খ্রি.) মসজিদে নববীর বড়ো আকারে সম্প্রসারণ করা হয়। এই সম্প্রসারণের ফলে প্রাচীন সুফফা চত্বরটি, যেটি একসময় মসজিদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত চিহ্নিত করত, মূল মসজিদের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এর অবস্থান পরিবর্তিত হয়। সম্প্রসারিত মসজিদের যে অংশটি 'দিক্কাত আল-আগাওয়াত' (خلفاء এবং دورগারার মঞ্চ) নামে পরিচিত, তার সাথেই ঐতিহাসিক সুফফার স্মৃতি জড়িত বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৫০)। যদিও ভৌত কাঠামোটি আর আগের মতো অবশিষ্ট নেই, তবু এর আদর্শ ও চেতনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থাপত্যের মাধ্যমে একটি স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে আছে।

মসজিদে নববীর মানচিত্রে সুফফার অবস্থান ও গুরুত্ব

মসজিদে নববীর স্থাপত্যিক বিন্যাসে সুফফার অবস্থান ছিল অনন্য এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি মসজিদের উত্তর-পূর্বাংশে, রাসূল (সা.)-এর হুজরার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ দিকে ছিল রাসূল (সা.)-এর ও তাঁর পরিবারের বসবাসের কক্ষসমূহ (হুজরাত), আর পশ্চিম পাশে ছিল মিহরাব (ইবনে জাবালা, ১৯৮৮: ৭২)।

এই বিন্যাস একটি গভীর তাৎপর্য বহণ করে। প্রথমত, এটি মসজিদের ইবাদতগাহের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকায় সুফফার বাসিন্দারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারতেন, রাসূল (সা.)-এর খুতবা শুনতে পেতেন এবং প্রতিদিনের কোরআন তিলাওয়াতে শরিক হতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, রাসূল (সা.)-এর হুজরা এত কাছে থাকায়, তারা প্রায় প্রতি মুহূর্তে নবীর (সা.) সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতেন। তারা রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর পারিবারিক আচরণ, এবং রাতের ইবাদত সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন যা ছিল তাদের জন্য জীবন্ত শিক্ষার পাঠশালা (হামিদুল্লাহ, ২০০৩: ১৫৮)।

তৃতীয়ত, মিহরাবের সান্নিধ্য তাদের কিবলা ও ইবাদতের শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলেছিল। চতুর্থত, সুফফা ছিল মসজিদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, যা ছিল মদিনার বাইরে থেকে আগত কাফেলাগুলোর প্রবেশপথের দিক। ফলে আগন্তুকরা প্রথমেই ইসলামী রাষ্ট্রের এই 'মানবিক চেহারা' দেখতে পেত একদল দরিদ্র কিন্তু মর্যাদাবান শিক্ষার্থী, যারা জ্ঞান ও ইবাদতে মশগুল (আক্কাদ, ১৯৭৪: ৯০)।

এই কৌশলগত অবস্থান সুফফাকে একটি 'জিওপলিটিকাল সেন্টার' এর মতো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। এটি ছিল মুসলিম উম্মাহর হৃদপিন্ড, যেখান থেকে জ্ঞান, আদর্শ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ সারা আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ত। আধুনিক নগর পরিকল্পনাবিদরা যেমন একটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরি রাখার কথা বলেন, সুফফা ছিল ঠিক তেমনই মদিনা রাষ্ট্রের একেবারে কেন্দ্রে, শাসকের দরজার পাশে, এক দরবার-ই-আলিয়া, এক শিক্ষা-ই-আলিয়া।

অধ্যায় ৩: মেহমানানে রাসূল ﷺ: কারা ছিলেন আসহাবে সুফফা?

যে মানুষগুলো এই ছাউনির নিচে বাস করতেন, তারা কারা ছিলেন? কেন তারা গৃহহীন হলেন? তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানই বা কী ছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সুফফার প্রকৃত চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। তারা ছিলেন এক ভিন্নধর্মী সম্প্রদায়, যাদের জীবন রহস্য ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

সংজ্ঞা ও পরিচয়: 'আহলুস সুফফা' বনাম 'আসহাবে সুফফা'

আরবি ভাষায় 'আহল' (أهل) এবং 'সাহিব' (صاحب) শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। 'আহলে সুফফা' বলতে সুফফার পরিবার বা সুফফার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সম্প্রদায়কে বোঝায়, যা একটি স্থায়ী আবাসিক ধারণা দেয়। অপরদিকে 'আসহাবে সুফফা' (একবচন: সাহিব) বলতে সুফফার সঙ্গী বা অধিবাসী বোঝায়, যা একটি আত্মিক ও শিক্ষাগত সম্পর্ককেও নির্দেশ করে (আল-জুহাইলি, ২০০২: ২/১৮০০)। হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় 'আহলুস সুফফা' (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২) এবং 'আসহাবে সুফফা' (তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮) উভয় পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, তারা ছিলেন সাহাবিদের একটি বিশেষ দল, যাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা, পরিবার বা অর্থনৈতিক ভিত্তি মদিনায় ছিল না। তারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ইবাদত, জ্ঞানার্জন এবং রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৬)। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) তাদেরকে 'ইসলামের ছাত্রাবাসের প্রথম আবাসিক ছাত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৫)।

কেন তারা গৃহহীন ও নিঃস্ব ছিলেন? মক্কার বিত্তৈশ্বর্য ত্যাগের কাহিনি

আসহাবে সুফফার গৃহহীনতার পেছনে মূল কারণ ছিল মক্কা থেকে হিজরত। মক্কায় ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। তাদের সমাজচ্যুত করা হয়, ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়, বয়কটের মাধ্যমে তাদের খাদ্য-পানীয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন হিজরতের অনুমতি এলো, তখন অনেক

সাহাবি তাদের জীবনের সবকিছু বাড়িঘর, জমিজমা, ব্যবসা, এমনকি নিজের পরিবারের সদস্যদেরও ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) জন্য মদিনায় চলে আসেন (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ৮৯)।

এই ত্যাগের মাত্রা ছিল অভাবনীয়। হজরত সুহাইব রুমি (রা.)-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি যখন হিজরত করতে চাইলেন, তখন কুরাইশরা তাকে বলল, "তুমি গরিব অবস্থায় মক্কায় এসেছিলে, এখানে ধনী হয়েছ। তোমার সব সম্পদ রেখে তবে যেতে হবে।" সুহাইব (রা.) তার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ কুরাইশদের দিয়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে মদিনায় রওনা হন। রাসূল (সা.) তাকে দেখে তিনবার বলেছিলেন, "আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে!" (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/৪৭৮; আল-হাকিম, ১৯৯০: ৩/৪৫৪, হাদীস: ৫৭০০, সহীহ সনদে)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর মতো অন্ধ সাহাবিও নির্যাতন সহ্য করে মদিনায় হিজরত করেন। হজরত বিলাল (রা.)-এর কাছে তো ত্যাগ করার মতো কোনো সম্পদই ছিল না, বরং তাঁর সম্পদ ছিল শুধু ঈমান ও দাসত্ব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই মানুষগুলো যখন মদিনায় পৌঁছান, তখন তাদের কাছে সহায়-সম্বল কিছুই ছিল না। আনসার সাহাবিরা তাদের থাকার জায়গা দিলেও, সকলের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তদুপরি, এই মুহাজির সাহাবিরা জ্ঞান ও ইবাদতের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট ছিলেন যে, তারা বাইরে উপার্জনে যাওয়ার বা কৃষিকাজ শেখার চেয়ে মসজিদে নববীতে রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে থাকাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতেন (আল-বালাযুরি, ১৯৯৬: ১/২০৫)।

তরুণ, অবিবাহিত ও ইলম-পিপাসু: তাদের ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল

আসহাবে সুফফার একটি গুরুত্বপূর্ণ ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ এবং অবিবাহিত (নাওয়াব, ১৯৮৯: ৩২)। বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের জীবন ছিল অনেকটাই দায়িত্বহীন, যে কারণে তারা সম্পূর্ণ সময় মসজিদে অবস্থান করতে পারতেন। তাঁরা অন্য কোনো জীবিকা গ্রহণ না করে সরাসরি রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে ইলম ও হিকমত অর্জনকেই নিজেদের ধ্যান-জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হাফেজ আবু নুআইম (রহ.) তার 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে সুফফার স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ৭০ বলে উল্লেখ করেছেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৩৮)। অপরদিকে, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) তাদের সংখ্যা ৪০০ পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার কথা বলেছেন, বিশেষ করে যখন বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল রাসূল (সা.)-এর কাছে ইসলাম শিখতে এসে সাময়িকভাবে এখানে অবস্থান করত (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৫)। সংখ্যার এই হ্রাস-বৃদ্ধি ছিল একে একটি প্রাণবন্ত ও গতিশীল শিক্ষাঙ্গনের প্রতীক করে তুলেছিল।

তাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক অবস্থানের মানুষ ছিলেন কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেমন আবু হুরায়রা (রা.) ও আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.), ছিলেন পারস্যের ধর্মযাজক পরিবারের সন্তান সালমান ফারসি (রা.), ছিলেন আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস বিলাল (রা.), ছিলেন রোমান বংশোদ্ভূত সুহাইব রুমি (রা.)। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্প্রদায়ের মিলনস্থল ছিল ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ, জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ পিপাসা এবং আত্মশুদ্ধির অদম্য স্পৃহা (আল-আত্তাস, ২০১১: ৩৩)। তাদের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল 'ইলম-পিপাসা'। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ইসলামের মূলনীতি, কোরআনের তাফসীর, হাদিস, ফিকহ এবং আত্মশুদ্ধির জ্ঞান রাসূল (সা.)-এর মুখ থেকে সরাসরি অর্জন করাকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন।

অধ্যায় ৪: দারিদ্র্যের মাঝে অমূল্য রত্ন: প্রামাণ্য হাদিস ও ইতিহাসের আলোকে তাদের মর্যাদা

আসহাবে সুফফার প্রকৃত মর্যাদা নিহিত তাদের বাহ্যিক দারিদ্র্য ও অভাবের বিপরীতে তাদের আত্মিক ঐশ্বর্যে। পবিত্র কোরআন ও অসংখ্য হাদিস তাঁদের বিশেষ অবস্থানকে সুসংহত করেছে। পাশাপাশি, তৎকালীন আরব সমাজের প্রেক্ষাপটে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আব্রাহার প্রতিশোধের শপথ ও বনি কেনানার এক ব্যক্তির দ্বারা কাবা অপবিত্র করার ঘটনা তৎকালীন আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই 'আহলে সুফফা'-র মত দরিদ্র, একনিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে।

সূরা বাকারার ২৭৩ নং আয়াতের প্রেক্ষাপট ও তাফসির

পবিত্র কোরআনের সূরা আল-বাকারার ২৭৩ নম্বর আয়াতটি আসহাবে সুফফা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মুফাসসিরদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

"(সাদাকা) সেইসব অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত যে, তারা জমিনে চলাফেরা করতে পারে না (জীবিকার সন্ধানে)। অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে, কারণ তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না। তুমি তাদের চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দেখে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দার মতো ভিক্ষা করে না। আর তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।" (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন, এই আয়াতটির শানে নুযুল (অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট) সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি আসহাবে সুফফার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা ছিলেন প্রায় চারশত সাহাবির একটি দল, মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। তাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান, পরিবার বা অর্থনৈতিক উপার্জনের পথ ছিল না (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৬)।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তার বিখ্যাত 'আল-জামি লি-আহকাম আল-কুরআন' গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এখানে এমন একটি জাতির কথা বলা হয়েছে, যারা ইলম ও জিহাদের জন্য নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মানুষের কাছে কায়মনোবাক্যে কিছু চায় না, এবং নিজেদের অভাব গোপন রাখে। এটি তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ" (কুরতুবী, ২০০৩: ৩/৩৪০)।

আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ বলেন, "তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ তা জানেন।" এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সাহায্য কেবল তাদেরই করা উচিত যারা সত্যিকারের যোগ্য এবং অভাবী, এবং এই দানের হিসাব আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত। সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এই আয়াতটি সমাজের এমন একটি অংশের পরিচয় দেয়, যারা "যোগ্য দরিদ্র" (deserving poor) যারা নিজেদের ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করছে, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল নয় বলে বিত্তবানদের কাছে উপেক্ষিত থেকে যায়। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি এই অংশের বিশেষ যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার চর্চাকে উৎসাহিত করে (আল-গাজালি, ২০০১: ১২৫)।

'সদকা' ও 'হাদিয়া'র বিধানে তাদের বিশেষ Status

ইসলামী শরীয়তে 'সদকা' ও 'হাদিয়া'র বিধান ভিন্ন। সদকা হলো ফরজ বা নফল দান, যা সাধারণত গরিব ও অভাবীদের জন্য নির্ধারিত। অপরদিকে, হাদিয়া হলো উপহার, যা সামাজিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার প্রতীক। নবীজির (সা.) জন্য সদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আসহাবে সুফফার জন্য তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার ছিল অনন্য। হাদিস শরীফে এসেছে, "রাসূল (সা.)-এর নিকট যখন কোনো সদকা আসত, তিনি তা আসহাবে সুফফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, নিজের জন্য কিছু রাখতেন না। আর তাঁর কাছে কোনো হাদিয়া এলে, তিনি সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করে বাকি অংশ আসহাবে সুফফার সাথে ভাগ করে খেতেন" (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২; আহমদ, হাদীস: ২৩৪২০)।

এই নীতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহণ করে: প্রথমটি হলো রাসূল (সা.)-এর বিনয় ও ত্যাগ, যিনি নিজের জন্য সদকা গ্রহণ না করে তার সবটুকুই দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য

বরাদ্দ করতেন। দ্বিতীয়টি হলো আসহাবে সুফফার প্রতি রাসূল (সা.)-এর গভীর ভালোবাসা। তিনি তাদের শুধু দারিদ্র্যের জন্যই সাহায্য করতেন না, বরং তাদের জ্ঞানার্জন ও ইবাদতের জীবনকে সম্মান জানিয়ে তাদের সাথে নিজের হাদিয়ার অংশও ভাগ করে খেতেন। এটি ছিল তাদের প্রতি এক বিশেষ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ (আল-বুতি, ২০০১: ১৬০)। সমাজকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি বৈপ্লবিক মডেল, যেখানে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র ও সমাজের সরাসরি সহযোগিতায় তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। একে আধুনিক ‘স্কলারশিপ প্রোগ্রাম’ বা ‘বৃত্তি ব্যবস্থাপনার’ একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

হাদিসে বর্ণিত তাদের ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা ও পরকালীন সুসংবাদ

তাদের দারিদ্র্যের বর্ণনা হাদিসে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) নিজেও আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, “আমি আসহাবে সুফফার সত্তরজনকে দেখেছি, যাদের কারো গায়ে বড় চাদর (রিদা) ছিল না। হয়তো ছিল কেবল তহবন্দ (ইজার) কিংবা ছোট চাদর (কিসা), যা তারা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। কারো পায়ের নিসফে সাক (অর্ধ-হাঁটু) পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছাত। তারা লজ্জা-স্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।” (বুখারি, হাদীস: ৪৪২)

অন্য এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, “আসহাবে সুফফা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের নির্ভর করার মতো পরিবার-স্বজন বা ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। আল্লাহর শপথ! আমি ক্ষুধার জ্বালায় নিজের পেট মাটিতে চেপে ধরে থাকতাম এবং কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম, যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি” (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২; তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮, হাসান সহীহ)।

এই বর্ণনাগুলো শুধু দারিদ্র্যের চিত্র নয়, বরং তা আত্মমর্যাদা ও ধৈর্যের একটি মহাকাব্য। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাদের জ্ঞান ও ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাদের এই ত্যাগের পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে। একবার রাসূল (সা.) আসহাবে সুফফার চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কষ্ট দেখতে পেয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, “তোমরা যদি জানতে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কী প্রস্তুত রয়েছে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কামনা করতে যে,

আমাদের দারিদ্র্য ও উপবাস যেন আরও বেড়ে যায়।" (তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮; আহমদ, হাদীস: ২৩৪২০)

বনি কেনানার এক ব্যক্তির গির্জা অপবিত্র করার কাহিনী এবং আব্রাহার প্রতিশোধের শপথ

আসহাবে সুফফার প্রেক্ষাপট বুঝতে তৎকালীন আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা স্মরণ করা জরুরি। এই ঘটনাটি হলো কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত আব্রাহার প্রতিশোধের শপথের পটভূমি, যা সরাসরি 'আসহাবে সুফফা'-র সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি দেখায় কিভাবে কাবা এবং এর পবিত্রতা রক্ষা ছিল সমগ্র আরবের জন্য একটি অভিন্ন ধর্মীয় চেতনার বিষয়।

ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের বর্ণনামতে, আব্রাহা আল-আশরাম, যিনি ইয়েমেনে আবিসিনিয়ার (আকসুম রাজ্যের) ভাইসরয় ছিলেন, সানা'য় 'আল-কুল্লাইস' নামে একটি বিশাল ও সুসজ্জিত গির্জা নির্মাণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আরবদের হজ্জকে কাবা থেকে সরিয়ে এই গির্জার দিকে নিয়ে আসা। এই পরিকল্পনা আরবদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দেয় (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/৫৪)।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বনি কেনানা গোত্রের (বা কোনো কোনো বর্ণনায় বনি ফুকাইম) এক ব্যক্তি আব্রাহার এই পরিকল্পনায় এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে, তিনি এক রাতে সানায় প্রবেশ করে 'আল-কুল্লাইস' গির্জার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে পায়খানা-মূত্র ত্যাগ করে গির্জার বেদি ও দেয়াল অপবিত্র করে রাতে পালিয়ে যান (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৩৫; তাবারি, ১৯৮৭: ২/১৩০)। এটি ছিল কাবার পবিত্রতার প্রতি আরবদের গভীর আনুগত্যের এক চরম প্রকাশ।

এই সংবাদ যখন আব্রাহার কাছে পৌঁছায়, তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং কাবা ধ্বংস করার জন্য প্রতিশোধের ভয়ঙ্কর শপথ গ্রহণ করে। একটি বিশাল হস্তী বাহিনী নিয়ে সে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। এই অভিযান ইতিহাসে 'আম আল-ফিল' বা হস্তীর বছর নামে পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা ফীলে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে

প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছিল পোড়ামাটির কংকর। অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণসদৃশ (খড়কুটার মতো) করে দেন।” (সূরা আল-ফীল: ১-৫)।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কাবা শরিফ ছিল তৎকালীন আরবের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। আরবের মানুষ, এমনকি মূর্তিপূজারীরাও, কাবার প্রতি যে কোনো ধরনের অসম্মান বা আধিপত্যের প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে প্রতিহত করত। আসহাবে সুফফার জীবন ও ত্যাগ এই পবিত্র কাবা এবং মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। তারা দেখিয়েছিলেন, পাথরের ঘরের পবিত্রতা রক্ষার চেয়েও বড় হলো, সেই ঘরের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তার জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মোৎসর্গ করা।

পর্বের উপসংহার ও আত্মজিজ্ঞাসা

আমরা দেখলাম, মদিনার মাটিতে রহমতের ছায়া কিভাবে নেমে এসেছিল, কিভাবে সাধারণ স্থাপত্যের মাধ্যমে একটি অসাধারণ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিভাবে তরুণ, গৃহহীন ও দরিদ্র একদল মানুষ জ্ঞান ও ভালোবাসার অনন্য মডেল হয়ে উঠেছিলেন এবং দারিদ্র্যের মাঝে কিভাবে তারা অমূল্য রত্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

এখন আত্মজিজ্ঞাসার সময়: আমাদের জীবনের ‘সুফফা’ কোথায়? আমাদের কি কোনো 'হিজরত' আছে কোনো পাপ, বদ অভ্যাস, অথবা বস্তুবাদী ভোগ-বিলাস ছেড়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার ত্যাগ? আমরা যখন জ্ঞানার্জনের কথা ভাবি, তখন কি আমাদের মনে হয় সেই জ্ঞান যেন দুনিয়ার চাকরি অথবা বিত্ত অর্জনের সিঁড়ি না হয়ে, আত্মার খোরাক ও সৃষ্টির সেবার মাধ্যম হয়? আমরা কি আমাদের আশেপাশের ‘আসহাবে সুফফা’দের সেই সব ত্যাগী শিক্ষার্থী বা গরীব প্রতিবেশীকে চিনতে পারি, যারা নিজেদের অভাব প্রকাশ করে না? কিংবা আমরা কি সেই ধনী আনসার হতে পারি, যারা নিজেদের সম্পদ তাদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে কৃতজ্ঞতা বোধ করি?

এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বের দিকে অগ্রসর হব, যেখানে আমরা দেখবো কিভাবে এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তারা ইবাদত ও জ্ঞানের এক অনন্য নগরী গড়ে তুলেছিলেন,

এবং কিভাবে রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে তারা বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির ও আধ্যাত্মিক গুরুর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব: ইলম ও ইবাদতের প্রাঙ্গণ

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত একটি চত্বর, যেখানে দিন-রাত উচ্চারিত হতো কোরআনের বাণী, রাসূলের (সা.) দেখানো পথ ধরে তৈরি হতো একদল অনন্য মানুষ। আসহাবে সুফফা ছিলেন এমনই এক আবাসিক শিক্ষার্থীদল, যাঁদের সমগ্র জীবনটাই ছিল ইলম ও ইবাদতের এক অনন্য সমন্বয়। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রাঙ্গণ কেবলমাত্র একটি স্থাপনা ছিল না; এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র, যেখানে মানবজীবনের প্রতিটি দিক নিখুঁতভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত। এই পর্বে আমরা সেই শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামো, শিক্ষকবৃন্দ, পাঠ্যক্রম ও জ্ঞানসাধনার অনন্য দৃষ্টান্তগুলি বিশদভাবে পর্যালোচনা করব।

অধ্যায় ৫: ইসলামের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়

মানব ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা সুপ্রাচীন। গ্রিক সভ্যতার প্লেটোর 'একাডেমি', চীনা সভ্যতার 'তাইহসুয়ে' বা ভারতীয় উপমহাদেশের 'তক্ষশিলা' ও 'নালন্দা' প্রাচীন উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ইসলামী সভ্যতায় যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল, তা হলো মসজিদে নববীর সুফফা চত্বর। ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ যথার্থই বলেছেন, "সুফফা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাত্রাবাস, যা একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল" (হামিদুল্লাহ, ২০০৩: ১৫৮)।

সুফফার শিক্ষাক্রম: প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান থেকে উচ্চতর শাস্ত্রজ্ঞান

সুফফার শিক্ষাক্রম ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও ধাপভিত্তিক। এটি কেবল কোরআন মুখস্থ করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম, যা একজন নিরক্ষর বেদুঈনকে সমাজের একজন জ্ঞানী নেতা, শিক্ষক, ও প্রশাসকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম ছিল। ঐতিহাসিক আল-সামহুদি (রহ.) 'ওয়াফা আল-ওয়াফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যে সকল সাহাবি অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন, তাদের জন্য প্রথমেই ছিল লেখা-পড়া শেখার ব্যবস্থা (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৪২)। বদরের যুদ্ধে বন্দী কুরাইশদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল, তাদের শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন দশজন মুসলিম শিশুকে লেখা-পড়া শেখায় (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ২/১৪)। এই শিক্ষকদের সুফফার শিক্ষার্থীদের জন্যও কাজে লাগানো হতো।

প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান অর্জনের পর শিক্ষার্থীরা কোরআন তিলাওয়াত ও হিফজের দিকে মনোনিবেশ করতেন। কোরআন শিক্ষা ছিল সুফফার শিক্ষার মূল ভিত্তি। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তাদের তাজবিদ ও কেরাত শেখানো হতো। যারা কোরআনের হাফিজ হয়ে যেতেন, তারা পরবর্তীতে হাদিস, ফিকহ, এবং ইসলামী আইনের অন্যান্য শাখায় জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেতেন (আল-বুতি, ২০০১: ১৭২)। এভাবেই সুফফার শিক্ষাক্রম একটি পিরামিডের মতো ছিল, যেখানে ভিত্তিতে প্রাথমিক সাক্ষরতা, মধ্যভাগে কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান, এবং শীর্ষে ছিল উচ্চতর শাস্ত্রজ্ঞান ও গবেষণা।

ইসলামী জ্ঞানচর্চার ইতিহাসবিদ ড. স্পাহিচ ওমর উল্লেখ করেন, “সুফফার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ‘ইন্টারডিসিপ্লিনারি’ অর্থাৎ বহুমাত্রিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। কোরআনকে কেন্দ্র করে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, আইন, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র সবই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল” (Omer, ২০০৯: ১৪২)। যারা সামরিক কৌশলে পারদর্শী ছিলেন বা হতে চাইতেন, তারা হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-এর মতো শিক্ষকের কাছে প্রশিক্ষণ নিতেন। যারা বিচার ও আইন শিখতে আগ্রহী, তারা মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে পাঠ নিতেন। অর্থাৎ, সুফফা ছিল একটি ‘ওপেন-ক্রেডিট সিস্টেম’-এর মতো, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা পেতেন (আল-কাদি, ২০০৭: ১৫০)।

সার্বক্ষণিক বনাম খন্ডকালীন শিক্ষার্থী: ভর্তি প্রক্রিয়া ও জীবনযাপন

সুফফার শিক্ষার্থীদের দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়: সার্বক্ষণিক (full-time) এবং খন্ডকালীন (part-time) শিক্ষার্থী। যারা সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী ছিলেন, তারা মূলত ছিলেন সেইসব দরিদ্র, গৃহহীন মুহাজির, যাদের মদিনায় অন্য কোনো আশ্রয় বা উপার্জনের মাধ্যম ছিল না। তারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ইলম ও ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। হাফেজ আবু নুআইম (রহ.) ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ গ্রন্থে এই স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা ৭০ বলে উল্লেখ করেছেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৩৮)।

অপরদিকে, খন্ডকালীন শিক্ষার্থী ছিলেন সেই সাহাবিরা, যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজ করে দিনের বেলা জীবিকা নির্বাহ করতেন, কিন্তু রাতে বা অবসর সময়ে সুফফায় এসে জ্ঞানচর্চা করতেন। কেউ কেউ মদিনার আনসার ছিলেন, আবার কেউ কেউ বাইরের গোত্র থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মত ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিরাও সময় পেলেই সুফফায় এসে রাসূল (সা.)-এর পাঠে অংশ নিতেন (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৭)।

এখানে ভর্তির কোনো জটিল প্রক্রিয়া ছিল না। কোনো প্রবেশিকা পরীক্ষা ছিল না, ছিল না কোনো বয়সের সীমা, গোত্র বা অর্থনৈতিক যোগ্যতার বিধিনিষেধ। শুধুমাত্র জ্ঞানের প্রতি পিপাসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি ভালোবাসাই ছিল ভর্তির একমাত্র যোগ্যতা। তৎকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে মানুষ দলে দলে এসে সুফফায় যোগ দিতেন, জ্ঞান অর্জন করতেন এবং নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে

ইসলাম প্রচার করতেন (আল-জুহাইলি, ২০০২: ২/১৮০২)। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে একে আমরা 'ওপেন ইউনিভার্সিটি' বা 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' মডেলের একটি প্রাচীনতম উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ছিল চরম কঠোরতা ও সাধনার। ভোরবেলা ফজরের নামাজের পর শুরু হতো তাদের পাঠচক্র। রাসূল (সা.) নিজে অথবা তাঁর নিযুক্ত প্রশিক্ষক তাদের পাঠ দিতেন। দুপুরে বিশ্রাম ও নামাজের পর আবার চলত কোরআনের তিলাওয়াত ও আলোচনা। রাতে রাসূল (সা.)-এর নিকট সমবেত হয়ে তারা হাদিস ও ফিকহের সবক নিতেন। রাতের শেষ প্রহরে তারা গভীর ইবাদতে মশগুল থাকতেন (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৬)।

সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি: কেন কখনো ৭০, কখনো ৪০০ জনের আবাস ছিল?

সুফফার শিক্ষার্থী সংখ্যা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। হাফেজ আবু নুআইম (রহ.) স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ৭০ জন বলে উল্লেখ করেছেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৩৮)। অপরদিকে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) তার গবেষণায় বলেছেন যে, সুফফার সদস্য সংখ্যা মোট ৪০০ পর্যন্ত পৌঁছেছিল (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৫)। এই আপাত-বিরোধী পরিসংখ্যানের পেছনে একটি সুন্দর যুক্তি রয়েছে।

প্রথমত, ৭০ ছিল স্থায়ী বাসিন্দা বা 'কোর মেম্বার', যাঁরা সর্বদা সেখানে অবস্থান করতেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আরব গোত্র থেকে ইসলাম শেখার জন্য প্রতিনিধি দল (وفود – উফুদ) আসতেন। সীরাতুল্লাহ ইবনে হিশাম (১৯৫৫: ৪/১৮৫) অনুসারে, ৯ম হিজরিকে 'আম আল-উফুদ' বা প্রতিনিধি দলের বছর বলা হয়, কারণ এই বছর বহু প্রতিনিধি দল মদিনায় এসেছিল। এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সাময়িকভাবে সুফফায় অবস্থান করতেন। তাঁদের আগমনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ত, আবার তাঁরা চলে গেলে কমে যেত। তৃতীয়ত, অনেক মুহাজির পরবর্তী সময়ে খাইবার যুদ্ধের পর অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে অথবা বিয়ে-শাদি করলে সুফফা ছেড়ে মদিনার অন্যান্য স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সুতরাং, সুফফার ছাত্রসংখ্যা ছিল গতিশীল ও তরল (আক্কাদ, ১৯৭৪: ১১২)।

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মডেল হিসেবে আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাই এটি ছিল একটি ‘ওপেন-এন্ডেড এনরোলমেন্ট’ সিস্টেম বা ‘রোলিং অ্যাডমিশন’ পদ্ধতি, যা একজন শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ও বিযুক্ত হতে দেয়।

অধ্যায় ৬: সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও তাঁর পাঠশালা

শিক্ষকের মর্যাদা ও গুরুত্ব শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিসীম। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, পুস্তকাগার বা পাঠ্যক্রম যতই উন্নত হোক না কেন, যদি শিক্ষক প্রজ্ঞাবান, সহানুভূতিশীল ও নিবেদিতপ্রাণ না হন, তবে শিক্ষা কখনো তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। সুফফা চত্বরের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন স্বয়ং বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, নবীকুলের শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি কেবল একজন জ্ঞানদাতাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন পুরো শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র, এক জীবন্ত আদর্শ, এবং সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার উৎস। ড. মুহাম্মাদ তাহির-উল-কাদরী যথার্থই বলেন, "রাসূল (সা.)-এর সমগ্র দাওয়াতি জীবন ছিল এক অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, এবং সুফফা ছিল তার সবচেয়ে নিবিড় পাঠশালা" (কাদরী, ২০০৬: ২৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরাসরি শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সকল মানদণ্ডেও অসাধারণ। তাঁর পদ্ধতিতে কোনো একঘেয়েমি ছিল না। তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও বোধশক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রধান শিক্ষাদান পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

মুজাকারা (আলোচনা ও মতবিনিময়): রাসূল (সা.) প্রায়ই সাহাবিদের নিয়ে আলোচনার বৈঠক বসাতেন। তিনি কোনো বিষয় এককভাবে বক্তৃতা দিয়ে শেষ করে দিতেন না, বরং সাহাবিদের প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতেন এবং তাদের উত্তর শুনতেন। একবার জিবরাইল (আ.) এসে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রাসূল (সা.) উত্তর দেওয়ার পর সাহাবিদের বলেছিলেন, "ইনি জিবরাইল, তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন" (বুখারি, হাদীস: ৫০; মুসলিম, হাদীস: ৮)। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান ছিল তাঁর প্রিয় পদ্ধতিগুলোর একটি। সুফফার শিক্ষার্থীরা প্রায়ই তাঁকে কোরআনের আয়াত, ফিকহি মাসআলা এবং আত্মশুদ্ধির নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন করতেন। তাদের প্রশ্নের উত্তরে অনেক হাদিস ও আয়াতের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে (আল-হাকিম, ১৯৯০: ২/২৫৮)।

দৃষ্টান্ত ও রূপকের ব্যবহার: রাসূল (সা.) জটিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলো বোঝানোর জন্য প্রায়ই বাস্তব জীবনের উদাহরণ ও রূপকের আশ্রয় নিতেন। মুসলিম শরিফের একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে একটি নদীর সাথে তুলনা করে বলেছেন, "যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তেমনি; এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার গুনাহগুলো মুছে দেন" (বুখারি, হাদীস: ৫২৮; মুসলিম, হাদীস: ৬৬৭)। সুফফার শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরণের উপমা ছিল খুবই কার্যকর, কারণ তাদের অধিকাংশই ছিলেন সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত আরবীয় যুবক, যাদের কাছে প্রকৃতি ও জীবনের এ ধরণের উপমা খুব সহজেই বোধগম্য হতো।

গল্প ও ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা: রাসূল (সা.) শিক্ষা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি বা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করতেন। পবিত্র কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তাদের বৃত্তান্তে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে" (সূরা ইউসুফ: ১১১)। রাসূল (সা.) সুফফার মজলিসে প্রায়ই বনি ইসরাইলের ঘটনা, হজরত মুসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর সফর, এবং আসহাবে উখদুদের করুণ কাহিনি শোনাতেন (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ৫/২১২)। এই গল্পগুলো শিক্ষার্থীদের মনে নৈতিকতা ও ঈমানের গভীর ছাপ ফেলত।

দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষা (Experiential Learning): এই পদ্ধতিটি ছিল সবচেয়ে অনন্য। রাসূল (সা.)-এর কাছে শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় আবদ্ধ কোনো তাত্ত্বিক বিষয় ছিল না। প্রতিটি কাজের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিতেন। কীভাবে খেতে হবে, কীভাবে ঘুমাতে হবে, কীভাবে স্ত্রীর সাথে আচরণ করতে হবে, কীভাবে বাজারে কেনাকাটা করতে হবে, কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে সবকিছুই ছিল তাঁর শিক্ষার অংশ। সুফফার শিক্ষার্থীরা যেহেতু রাসূল (সা.)-এর ঘরের পাশেই থাকতেন, তাই তারা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেতেন। তারা দেখতেন, রাসূল (সা.) কীভাবে তাহাজ্জুদ পড়েন, কীভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান, কীভাবে মেহমানের সাথে আচরণ করেন। এই প্রত্যক্ষদর্শনের মাধ্যমে তারা জ্ঞানের এমন একটি স্তর অর্জন করেছিলেন, যা শুধু বই থেকে আসা সম্ভব ছিল

না (আল-গাজালি, ২০০১: ১৩৫)। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে একে বলা হয় 'এমবডিড নলেজ' বা 'মূর্ত জ্ঞান'।

পুনরাবৃত্তি ও সংক্ষেপণ: গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য রাসূল (সা.) কথা তিনবার করে বলতেন এবং সময়ে সময়ে সংক্ষেপে সবক দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরতি দিয়ে দিয়ে সবক দিতেন, যাতে আমরা ক্লান্ত না হই" (বুখারি, হাদীস: ৬৮; মুসলিম, হাদীস: ২৮২১)। সুফফার শিক্ষার্থীরা ছিল জ্ঞানপিপাসু, কিন্তু একটানা দীর্ঘ সময় জ্ঞান দিলে মানুষের মনোযোগে বিচ্ছিন্নতা আসে এ শিক্ষাতত্ত্ব রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদানে বিদ্যমান ছিল।

কুরআন ও হাদিসে কুদসি শিক্ষাদানে বিশেষ গুরুত্ব

সুফফার পাঠশালায় কোরআন শিক্ষা ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। রাসূল (সা.) শুধু কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতেন না, বরং প্রতিটি আয়াতের তাফসীর, শানে নুযুল, এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগও শিক্ষা দিতেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "রাসূল (সা.) সাহাবিদেরকে কোরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই শিক্ষা দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি তাদের আক্ষরিক তিলাওয়াত শিক্ষা দিতেন" (ইবনে তাইমিয়া, ১৯৮৭: ১৩/৩৭০)।

একইভাবে, 'হাদিসে কুদসি' ছিল একটি বিশেষ জ্ঞানের শাখা, যার অর্থ হলো সেইসব বাণী, যার রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ, কিন্তু ভাষা রাসূল (সা.)-এর। এই বাণীগুলো সরাসরি আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর রহমত ও বান্দার সঙ্গে সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে। সুফফার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত ও আত্মশুদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, তাই তাদের জন্য হাদিসে কুদসি ছিল অমৃতসম। রাসূল (সা.) তাদেরকে প্রায়ই হাদিসে কুদসি শিক্ষা দিতেন। যেমন, একটি বিখ্যাত হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের জন্য জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না" (মুসলিম, হাদীস: ২৫৭৭)। এ ধরনের সরাসরি ঐশী বার্তা সুফফার শিক্ষার্থীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

প্রশিক্ষক হিসেবে উবাদাহ ইবনু সামিত ও আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদের ভূমিকা

স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর পাশাপাশি, তিনি সুফফার শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবিকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এদের মধ্যে উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) ছিলেন আনসার গোত্রের একজন বিশিষ্ট সাহাবি ও বদর যুদ্ধের বীর। তিনি ছিলেন কোরআন ও ফিকহে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। রাসূল (সা.) তাকে বিশেষভাবে সুফফার শিক্ষার্থীদের কোরআন, লেখা ও প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ৩/১১১৯)। আবু হুরায়রা (রা.)-এর মতো পরবর্তীকালের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস তাঁর কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্র বলছে, উবাদাহ (রা.) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মেথডিকাল ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ভুল শুধরে দিতেন, বারবার পড়াতেন, এবং তাদের সাথে নিয়ে কোরআনের হিফজ করতেন (ইবনে হাজার আসকালানি, ১৯৯৮: ২/২৮৪)।

অন্যদিকে, আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.) ছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত যুবক, যিনি প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। তাঁর লেখনি দক্ষতা ও জ্ঞান ছিল অসাধারণ। রাসূল (সা.) তাকে সুফফার প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন (আল-বালাযুরি, ১৯৯৬: ১/৪৭২)। তিনি বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের আরবি ক্যালিগ্রাফি ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ওহি লেখকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যা তাঁর ভাষাগত দক্ষতার সাক্ষ্য বহণ করে (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/৪৫)। তিনি শিক্ষার্থীদের এমনভাবে তৈরি করতেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে কোরআনের কপি তৈরি করতে পারে এবং দূরদূরান্তে চিঠিপত্র ও দাপ্তরিক নথি লিখতে পারে।

এই দুই গুণী প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সুফফার শিক্ষার্থীরা শুধু আধ্যাত্মিক ও মৌখিক জ্ঞানেই নয়, বরং প্রায়োগিক ও লিখিত জ্ঞানেও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, সুফফা ছিল মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক লিখিত শিক্ষারও কেন্দ্র।

অধ্যায় ৭: জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা: সুফফার সিলেবাস

সুফফা চত্বরের জ্ঞানচর্চা ছিল বহুমাত্রিক। আজকের দিনে যেমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইনের বিভিন্ন অনুষদ থাকে, তেমনি সুফফায়ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। রাসূল (সা.) নিজে ছিলেন এই বিশাল শিক্ষাঙ্গনের উপাচার্য, আর তাঁর বিশেষায়িত সাহাবিরা ছিলেন অনুষদীয় ডিনদের মতো, যাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ আল-আত্তাস বলেন, "সুফফা ছিল এমন একটি শিক্ষাঙ্গান, যেখানে জ্ঞানের কোনো বিভাজন ছিল না; বরং প্রতিটি জ্ঞান ছিল আল্লাহর একত্ববাদের আলোকে সমন্বিত শিক্ষা" (আল-আত্তাস, ২০১১: ৪৫)।

ফিকহ ও আইন বিচার: মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর প্রশিক্ষণ

সুফফার পাঠশালা থেকে ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) ও বিচার বিভাগের যে মেধাবী ক্যাডার তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)। তিনি ছিলেন তরুণ আনসার সাহাবী, যিনি বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানপিপাসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর কাছে তাঁর মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল" (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৫৪; আহমদ, ২২০৬২)।

ইয়েমেনে গভর্নর ও বিচারক হিসেবে প্রেরণের আগে মুয়াজ (রা.)-কে রাসূল (সা.) নিজে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনিই সুফফার শিক্ষার্থীদের ফিকহ ও আইন বিচারের জটিল বিষয়গুলো বোঝাতেন। ইতিহাসবিদ আল-ওয়াকিদি (রহ.) বর্ণনা করেন, মুয়াজ (রা.) সুফফার শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত হালাকা (আলোচনা চক্র) করতেন, যেখানে তিনি তাদের কোরআনের আয়াত থেকে আইনি নির্দেশনা বের করার পদ্ধতি, কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তি) ও মাসলাহা (জনস্বার্থ) নীতি শিক্ষা দিতেন (আল-ওয়াকিদি, ১৯৮৯: ৩/১০৬৫)। তিনি শেখাতেন, কীভাবে দুজন বিবাদমান ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হয়, কীভাবে সাক্ষ্যের সত্যতা যাচাই করতে হয় এবং কীভাবে ফয়সালা দিতে হয়। সুফফায় গড়ে ওঠা এই বিচারকদের তালিমের

কারণেই পরবর্তী খিলাফত আমলে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা এতটা সুসংহত ও কার্যকর হতে পেরেছিল (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ১১০)।

কেরাত ও তাজবিদ: সালিম (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর দক্ষতা

কোরআন তিলাওয়াতের শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে। রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করো আরবের সুরে" (বুখারি, হাদীস: ৩৫০১, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে বর্ণিত)। তিনি আরও বলেন, "যে কোরআন সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়" (বুখারি, হাদীস: ৭৫২৭, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে বর্ণিত)। সুফফার শিক্ষার্থীরা যাতে শুদ্ধ ও সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারেন, সে জন্য রাসূল (সা.) বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

সালিম (রা.), যিনি হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-এর মুক্ত দাস ছিলেন, তিনি ছিলেন সুফফার একজন বিশিষ্ট কেরাত বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর সুমধুর কণ্ঠের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহর শোকর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে সালিমের মতো কাউকে রেখেছেন" (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/২৩৪)। তিনি সুফফার শিক্ষার্থীদের তাজবিদের নিয়মকানুন, মাখরাজ ও সিফাত শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছ থেকেই পরবর্তী প্রজন্মের কারীরা কোরআনের সাতটি কেরাত শিখেছিলেন (আল-জুহাইলি, ২০০২: ২/১৭৮০)।

তেমনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন কোরআন ও তাফসিরের পণ্ডিত। রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করতে চায় অবিকল সেভাবে, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আবদের (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের) কেরাত অনুসরণ করে" (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৩৮; আহমদ, হাদীস: ৩৬)। ইবনে মাসউদ (রা.) শুধু নিজে পড়তেন না, তিনি সুফফার ছাত্রদেরকে নিয়ে বসতেন এবং তাদেরকে কোরআনের একটি একটি আয়াতের গভীর তাফসীর বুঝিয়ে দিতেন (আল-হাকিম, ১৯৯০: ২/৩৫৬)। বলা যায়, সুফফা ছিল 'ইলমে কেরাত'-এর প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা থেকে পরবর্তীতে কুফা ও বসরার মতো শহরে বিশাল তাফসীর মাদরাসা গড়ে উঠেছিল।

প্রশাসন ও অর্থনীতি: উমর (রা.)-এর প্রাথমিক শিক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.)-এর প্রশাসনিক প্রজ্ঞা ও কৃতিত্ব বিশ্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। কিন্তু এই প্রজ্ঞা তাঁর একদিনে আসেনি। যদিও তিনি সুফফার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে পরিগণিত নন, তবুও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রায়ই সুফফায় আসতেন এবং রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে রাষ্ট্রপরিচালনা, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন (নাজিবাবাদি, ২০০০: ১/২৬২)। ঐতিহাসিক ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি (রহ.) বলেন, "উমর (রা.) সুফফার মজলিসে বসে যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতির শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রতিফলন আমরা পরে দেখতে পাই তাঁর দিওয়ান (পেনশন ও বেতন ব্যবস্থা), বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার), এবং ভূমি সংস্কার নীতিতে" (সাল্লাবি, ২০০৬: ২৫০)।

সুফফার শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো, তার মধ্যে ছিল কর ব্যবস্থা, যাকাতের সঠিক ব্যবহার, গনিমতের সম্পদ বণ্টন, এবং জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যয়ের নীতি। রাসূল (সা.) নিজে আসহাবে সুফফার রসদ ও অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য যে সুচিন্তিত ব্যবস্থা করেছিলেন, তা-ই ছিল এক জীবন্ত অর্থনীতির পাঠশালা। উমর (রা.)-এর মতো প্রখর বুদ্ধিমত্তার মানুষ সেই পাঠ আত্মস্থ করে পরবর্তীতে একটি সুবিশাল সাম্রাজ্যের সফল প্রশাসনে রূপ দিতে পেরেছিলেন (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ১৫২)।

আধ্যাত্মিকতা ও তাসাউফ: আবু জর গিফারি (রা.) ও সালমান ফারসি (রা.)-এর ভিত্তি

সুফফার শিক্ষার অন্যতম প্রধান একটি স্তম্ভ ছিল আধ্যাত্মিকতা বা তাসাউফ। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী যুগের বিশুদ্ধ তাসাউফের মূল বীজ এই সুফফা চত্বরেই বপন করা হয়েছিল। অনেক ইতিহাসবিদ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মনে করেন যে, 'তাসাউফ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'সুফফা' থেকেই এসেছে (যদিও পশমের 'সুফ' থেকেও আসার তত্ত্ব প্রচলিত আছে) (আল-কালাবাজি, ১৯৯৩: ২১)। যাঁরা দুনিয়ার বিলাসিতা ত্যাগ করে আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের আত্মিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র ছিল এই সুফফা।

আবু জর গিফারি (রা.) ছিলেন এই আধ্যাত্মিক ধারার এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। রাসূল (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “আকাশের নিচে এবং জমিনের ওপরে আবু জরের চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কেউ নেই” (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৫৬; তিরমিযি, হাদীস: ৩৮০১)। তিনি ছিলেন দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি চরমভাবে বিমুখ এবং আল্লাহর প্রতি অত্যধিক ভালোবাসায় মশগুল। তিনি সুফফার শিক্ষার্থীদের শেখাতেন কীভাবে অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ দূর করতে হয়, কীভাবে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) করতে হয়, এবং কীভাবে রাত-দিন আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকতে হয় (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৮)।

অপরদিকে, সালমান ফারসি (রা.) ছিলেন জ্ঞানের ভিন্ন এক ধারার প্রতিনিধিত্ব। একজন পারসিক যুবক, যিনি অগ্নি উপাসক থেকে খ্রিস্টান হয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যের সন্ধানে রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতার গভীরতা ছিল অসাধারণ। তিনি বৈরাগ্যবাদের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনের সমন্বয়ের শিক্ষা দিতেন। ইমাম গাজালি (রহ.) তাঁর ‘ইহইয়া উলুম আল-দিন’ গ্রন্থে সালমান ফারসি (রা.)-এর বাণী ও জীবন থেকে আত্মশুদ্ধির অনেক নীতি উদ্ধৃত করেছেন (আল-গাজালি, ২০০১: ২/২৫০)।

আবু জর (রা.)-এর কঠোর দুনিয়াবিমুখতা ও সালমান ফারসি (রা.)-এর ভারসাম্যপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা এই দুই চরিত্রের সংমিশ্রণে সুফফার শিক্ষার্থীরা এক অনন্য আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। তারা শিখতেন, তাসাউফ মানে শুধু সংসার ত্যাগ করা নয়, বরং অন্তরকে আল্লাহর জন্য পরিশুদ্ধ করে সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করাই হলো প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা (আল-আত্তাস, ২০১১: ৬০)। পরবর্তীকালের ইমাম হাসান বসরি (রহ.)-এর মতো বুজুর্গ ব্যক্তিত্বগণও এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যায় ৮: আসহাবে সুফফার জ্ঞানসাধনার অনন্য দৃষ্টান্ত

জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের ত্যাগ ও কষ্টের বর্ণনা ইতিহাসে বিরল। আসহাবে সুফফা শুধু বসে বসে জ্ঞান লাভ করেননি, তাঁরা জ্ঞানকে ভালোবেসেছিলেন, জ্ঞানের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন এবং জ্ঞানের মর্মকে ধারণ করে নিজেদের জীবনকে বদলে দিয়েছিলেন। তাঁদের জ্ঞানসাধনার কিছু অনন্য দৃষ্টান্ত নিচে আলোচনা করা হলো, যা আজকের যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা।

গভীর রাতের কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও মুখস্থ করার পদ্ধতি

সুফফা চত্বরের রাতগুলো ছিল অন্যরকম এক জীবনের সাক্ষী। দিনের বেলা ক্ষুধার জ্বালায় যখন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ত, তখন রাতের নিস্তব্ধতায় তারা আল্লাহর বাণী নিয়ে মশগুল হতেন। রাসূল (সা.) নিজে রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ পড়তেন ও কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং সুফফার শিক্ষার্থীদেরও তা করতে উৎসাহ দিতেন (মুসলিম, হাদীস: ৭৬৩)। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "আসহাবে সুফফার অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের উপবাস ও তিলাওয়াতের আওয়াজ মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শোনা যেত" (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৪১)।

তাদের হিফজ বা মুখস্থ করার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একজন আরেকজনকে কোরআনের আয়াত শোনাতেন এবং ভুল ধরিয়ে দিতেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) আমাদেরকে দশটি করে আয়াত শিখিয়ে দিতেন, এবং যতক্ষণ না আমরা সেগুলো যথাযথভাবে মুখস্থ করে তদনুযায়ী আমল করতাম, ততক্ষণ পরবর্তী দশটি আয়াত পড়াতেন না" (আহমদ, হাদীস: ২২৯৪৫; তাবারানি, হাদীস: ৯/১৩৬)। তিনি আরও বলেন, "আমরা রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে কোরআনের জ্ঞানের সঙ্গে কাজ করার জ্ঞানও একত্রে অর্জন করতাম" (আহমদ, হাদীস: ২২৯৪৫)। এটি ছিল জ্ঞান ও আমলের এক চমৎকার সমন্বয়। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান বলে, তথ্যকে কাজে পরিণত করলে মস্তিষ্কের নিউরোনে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় (Medina, ২০০৮: ৯৫)। সুফফার সেই প্রাচীন পদ্ধতি আজকের শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে খাপে খাপ মিলে যায়।

হাদিস সংরক্ষণে তাদের অবদান: বিশেষ করে আবু হুরায়রা (রা.)-এর উদাহরণ

সুফফা চত্বরের সবচেয়ে বড় অবদানগুলোর একটি হলো হাদিস সংরক্ষণ। মহানবী (সা.)-এর বাণী ও কর্মের যে অমূল্য ভাণ্ডার আজ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তার একটি বিশাল অংশের কৃতিত্ব আসহাবে সুফফার, বিশেষ করে আবু হুরায়রা (রা.)-এর। আবু হুরায়রা (রা.) প্রায় তিন বছর রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্প সময়েই তিনি ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণনা করেছেন (ইবনে হাজার আসকালানি, ১৯৯৮: ৭/৩১৮)। এত অল্প সময়ে এত বিপুল সংখ্যক হাদিস কীভাবে তাঁর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হলো এই প্রশ্নটি সবসময়ই গবেষকদের কৌতূহলের বিষয়।

এর উত্তর নিহিত আছে সুফফার জীবনপদ্ধতির মধ্যে। আবু হুরায়রা (রা.) নিজেই বলেছেন, “লোকেরা বলে, আবু হুরায়রা অনেক হাদিস বর্ণনা করে। কিন্তু মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আনসার ভাইয়েরা খেজুর-বাগানে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ছিলাম একজন মিসকীন, যিনি পেটের তাগিদে রাসূল (সা.)-এর সাথে লেগে থাকতাম। আমি তখন উপস্থিত থাকতাম, যখন তারা অনুপস্থিত থাকতেন। আর আমি মনে রাখতে পারতাম, যখন তারা ভুলে যেতেন” (বুখারি, হাদীস: ১১৮; মুসলিম, হাদীস: ২৪৯২)। অর্থাৎ, তিনি নিজের পেটের দায়ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

এছাড়াও, তাঁর স্মৃতিশক্তির জন্য রাসূল (সা.)-এর একটি বিশেষ দোয়া ছিল। একবার তিনি নবীজির কাছে নিজের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথা বললে, রাসূল (সা.) তাঁর চাদর বিছিয়ে দিতে বলেন এবং তাতে কিছু রাখতে বলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, “আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম, তিনি তাতে কিছু রাখলেন। তারপর বললেন, ‘এটা তোমার বুকে জড়িয়ে নাও।’ আমি তা জড়িয়ে নিলাম। এরপর আর কোনো কিছুই আমি ভুলিনি” (বুখারি, হাদীস: ১১৯; মুসলিম, হাদীস: ২৪৯২)।

আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই একনিষ্ঠতা ও মেহনতের কারণেই হাদিসের বিশাল একটি অংশ সংরক্ষিত হয়েছে। তিনি শুধু শুনতেন না, বরং শুনে শুনে তা অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করতেন, আলোচনা করতেন এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। পরবর্তীতে তিনি মদিনায় ‘দার আল-হাদিস’ নামে একটি হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ইবনে শিহাব আল-জুহরি (রহ.)-এর মতো কিংবদন্তি মুহাদ্দিস (যাহাবি, ১৯৯৮: ৪/১৬০২)।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন: নবীর ﷺ প্রতিটি কাজ ও কথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

আসহাবে সুফফার জ্ঞানসাধনার সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান (direct knowledge) অর্জনের সুযোগ। গ্রিক দর্শনে প্লেটো যেমন 'আইডিয়াজ' বা 'ফর্মস'-এর তত্ত্ব দিয়েছেন, যেখানে প্রকৃত জ্ঞান হল নিখুঁত আকারের জ্ঞান, যা আমরা কেবল যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি, সেখানে ইসলামে নবী (সা.) ছিলেন জ্ঞানের সেই 'জীবন্ত নিখুঁত আকার'। আল্লামা ইকবাল বলেন, "নবী (সা.)-এর জীবন হলো কোরআনের বাস্তব রূপ" (ইকবাল, ২০১০: ১৩)।

সুফফার শিক্ষার্থীরা তাই নবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সাহাবি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন, "আমি একবার নবী (সা.)-এর সাথে রাতে নামাজ পড়ছিলাম, তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো ১০০ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো পুরো সূরাটা এক রাকাতেই শেষ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা আল-ইমরান তিনটি সূরাই ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করলেন" (মুসলিম, হাদীস: ৭৭২)। এই ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যা কোনো বই বা শিক্ষকের বক্তৃতা দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়, তা সুফফার শিক্ষার্থীরা অহরহ লাভ করতেন।

তাঁরা দেখতেন, রাসূল (সা.) কীভাবে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, কীভাবে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কীভাবে দাস-দাসীর সাথে কোমল আচরণ করছেন। তাঁরা লক্ষ্য করতেন, তিনি কখন রাগ করছেন, কখন নীরব থাকছেন, কখন হাসছেন। এ সবই ছিল চলমান একটি 'জীবন্ত কিতাব', যা থেকে সুফফার শিক্ষার্থীরা ইলম ও হিকমতের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের ভেতরে তা ধারণ করতেন (আল-গাজালি, ২০০১: ১১২)।

আজকের যুগে আমরা বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে বহু তথ্য মুখস্থ করতে পারি, কিন্তু একজন শিক্ষকের আচরণ, তাঁর সততা, সহানুভূতি ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা যা একটি স্পর্শ, একটি চাহনি, একটি নীরবতার মাধ্যমেও প্রকাশিত হয় তা কেবল প্রত্যক্ষ

সাহচর্যেই অর্জন করা যায়। আসহাবে সুফফার জীবনে এই প্রত্যক্ষতা ছিল বলেই তাঁরা কেবল জ্ঞানী হননি, বরং জ্ঞানের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন।

একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা ও শিক্ষা

জ্ঞানসাধনার জন্য ক্ষুধা আর কষ্টকে কীভাবে ভালোবেসে আপন করে নেওয়া যায়, তার এক অসাধারণ উদাহরণ হলেন ইমাম বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এক পেয়ালা দুধের ঘটনা। রাসূল (সা.) একদিন আবু হুরায়রা (রা.)-কে গৃহে ডেকে পাঠান। গৃহে এক পেয়ালা দুধ ছিল, যা হাদিয়া এসেছিল। রাসূল (সা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললেন, "যাও, সুফফার সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো!" (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২)।

আবু হুরায়রা (রা.) মনে মনে ভাবলেন, "এক পেয়ালা দুধ দিয়ে এতজনকে কী করে খাওয়ানো যাবে? আমি যদি এটুকু পান করতে পারতাম, আমার কত উপকার হতো। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর আদেশ তো পালন করতেই হবে।" তিনি সুফফার সবাইকে ডেকে আনলেন। প্রায় সত্তরজন মানুষ একটি ছোট্ট ঘরে সমবেত হলেন। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, "পান করাও।" আবু হুরায়রা (রা.) একে একে প্রত্যেককে পেয়ালাটি দিতে লাগলেন। অলৌকিকভাবে, প্রত্যেকেই তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন এবং শেষ পর্যন্ত পেয়ালা রাসূল (সা.)-এর হাতে এলো, তাতেও দুধ অবশিষ্ট ছিল। তারপর রাসূল (সা.) মুচকি হেসে বললেন, "হে আবু হুরায়রা! এবার তুমি ও আমি।" তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কে তৃপ্তি সহকারে পান করালেন, তারপর নিজে পান করলেন (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২; মুসলিম, হাদীস: ১৭২৭)।

এই ঘটনাটি সুফফা চত্বরের দুইটি অমূল্য শিক্ষা প্রদর্শন করে। প্রথমত, শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর প্রশ্নহীন আনুগত্য ও নিষ্ঠা। আবু হুরায়রা (রা.) নিজের ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের নির্দেশকে মান্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান ও ত্যাগের পরিবেশে আল্লাহর অপার রহমত। আল্লাহ সুফফার ত্যাগী শিক্ষার্থীদের জন্য এমন বারাকাহ দান করেছিলেন যে, অল্প এক পেয়ালা দুধ সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমরা যদি আমাদের জীবনে আসহাবে সুফফার জ্ঞানসাধনার এই মডেলকে বাস্তবায়িত করতে চাই, তাহলে কিছু বিষয় আমাদের মেনে চলা আবশ্যক। প্রথমত, 'জ্ঞানের জন্য সময় বের করা' আমাদের ব্যস্ত জীবনে একটু সময় বের করে প্রতিদিন কোরআন ও সহিহ হাদিস বুঝে পড়ার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, 'শিক্ষকের সান্নিধ্য গ্রহণ' শুধু বই নয়, বরং জ্ঞানী ও আল্লাহওয়ালা মানুষদের কাছে যাওয়া, তাদের দেখা, তাদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়া। তৃতীয়ত, 'জ্ঞানের সাথে আমল করা' আমরা যা শিখি, তা জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা, যেমন করে সুফফার শিক্ষার্থীরা দশটি আয়াত মুখস্থ করে সাথে সাথে তাতে আমল করতেন।

আমাদের জীবনের ছোট ছোট 'সুফফা' তৈরি করা যায় কি? পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সাপ্তাহিক একটি ইলমী মজলিস করা যায়, যেখানে কোনো জ্ঞানী আলেমের বই পড়া হবে, কিংবা কোনো তাফসির গ্রন্থ থেকে পাঠ নেওয়া হবে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আমরা ঘরে বসেই অনলাইনে জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে কোরআন ও হাদিসের ক্লাস করতে পারি। কিন্তু শর্ত একটাই নিয়ত হতে হবে ইখলাসপূর্ণ, এবং সাথে থাকতে হবে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের মানসিকতা।

তৃতীয় পর্ব: ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের অনন্য বন্ধন

জ্ঞান, ত্যাগ ও ইবাদতের ভিত্তির ওপর যখন মানবিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সোনালি ইট স্থাপিত হয়, তখনই গড়ে ওঠে এক অমর সভ্যতার প্রাসাদ। আসহাবে সুফফার জীবনের সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দিক হলো, রাসূল (সা.) ও ধনী সাহাবিদের সাথে তাঁদের যে মানবিক সম্পর্ক ছিল, সেই ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের অনন্য বন্ধন। এই সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগে ভরা এবং পার্থিব কোনো স্বার্থের উর্ধ্বে। তাঁরা ছিলেন পরস্পরের ভাই, পরস্পরের সহায়, পরস্পরের ভালোবাসার পাত্র। এই অংশে আমরা সেই হৃদয়স্পর্শী কাহিনিগুলো তুলে ধরব, যা আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে ভালোবাসার ঝর্ণাধারা বইয়ে দেবে।

অধ্যায় ৯: রাসূলের ﷺ আপনজন

আসহাবে সুফফা ছিলেন রাসূল (সা.)-এর হৃদয়ের খুব কাছের মানুষ। তারা তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁর দরবারের স্থায়ী ছাত্র ছিলেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা, তারা ছিলেন তাঁর 'মেহমান'। রাসূল (সা.) তাদের শুধু জ্ঞানই দিতেন না, তিনি তাদের ভালোবাসতেন, তাদের সাথে খেতেন, তাদের বিপদে কাঁদতেন, এবং তাদের আনন্দে হাসতেন। এই সম্পর্ক ছিল শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের চেয়েও গভীর; এটি ছিল পরিবারের মতো। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলেন, "রাসূল (সা.)-এর পরিবারের বাইরে সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন আসহাবে সুফফা" (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৮)।

রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁদের আহার, পানাহার ও আড্ডা

রাসূল (সা.)-এর জীবনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর পরিপূর্ণ মানবিকতা। তিনি কোনো দূরবর্তী রাজা বা সম্রাটের মতো বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতেন না। বরং, তিনি তাঁর সাহাবিদের সাথে মিশতেন, তাদের সাথে খেতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের সাথে হাসতেন। এই মানবিক আচরণের সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী ছিলেন আসহাবে সুফফা, কারণ তারা সবসময় তাঁর কাছাকাছি থাকতেন।

হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) প্রায়ই আসহাবে সুফফাকে নিজের ঘরে দাওয়াত দিতেন। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.)-এর কাছে কোনো হাদিয়া এলে তিনি আসহাবে সুফফাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তাদের সাথে ভাগ করে খেতেন" (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২)। তিনি কখনো তাদের দুধ পান করাতেন, কখনো খেজুর, ময়দা ও মাখন মিশ্রিত 'হাইস' নামক খাবার তৈরি করে খাওয়াতেন, আবার কখনো রুটি, গোশত ও সবজির সুপ দিয়ে আপ্যায়ন করাতেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ১/২৫৬)।

তবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো, এই আহার-অনুষ্ঠানগুলোতে সামাজিক কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আরব সমাজের রীতি অনুযায়ী, গোলামের পক্ষে তার মনিবের পাশে বসে খাওয়া ছিল অকল্পনীয়। অথচ রাসূল (সা.)-এর দস্তরখানে বিলাল (রা.)-এর মতো মুক্ত দাস এবং আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.)-এর মতো কুরাইশ

নেতা একসাথে বসে খেতেন। সমাজতাত্ত্বিক ড. আকবার শাহ নাজিবাবাদি বলেন, “রাসূল (সা.)-এর মজলিস ছিল এক নতুন সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাগার, যেখানে বংশ, বর্ণ ও অর্থনৈতিক মর্যাদার সকল বেড়াজাল ভেঙে ফেলা হয়েছিল” (নাজিবাবাদি, ২০০০: ১/২৬০)।

একবার এক ইহুদি রাসূল (সা.)-কে বিষ মেশানো একটি বকরির গোশত উপহার দিয়েছিল। খাইবারের এই ঘটনায় রাসূল (সা.)-এর সাথে আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য বিশর ইবনে বারা (রা.)-ও ছিলেন। রাসূল (সা.) গোশতের এক টুকরো মুখে দিয়ে বুঝতে পারেন যে তা বিষাক্ত, এবং তাৎক্ষণিক তা ফেলে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিশর ইবনে বারা (রা.) এক লোকমা গিলে ফেলেছিলেন, এবং পরবর্তীতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন (বুখারি, হাদীস: ২৬১৭; মুসলিম, হাদীস: ২১৯০)। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, আসহাবে সুফফা শুধু রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার সাথী ছিলেন না, বরং তারা তাঁর বিপদেরও সাথী ছিলেন।

রাসূল (সা.)-এর সাথে তাদের ‘আড্ডা’ বা অবসর সময়ের কথাবার্তাও ছিল শিক্ষণীয়। তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে গল্প শুনতেন, কৌতুক করতেন এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা কাহিনি জিজ্ঞাসা করতেন। রাসূল (সা.) তাদের সাথে এমন আন্তরিকতার সাথে মিশতেন যে, অপরিচিত কোনো আগন্তুক মসজিদে এলে চিনতে পারতেন না যে, এই সমবেত মানুষের মধ্যে নবী কে! একবার এক বেদুঈন মসজিদে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?” (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬৮)। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) কতটা বিনয়ী ও সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

‘এক পেয়ালা দুধে’র মুজিজা ও তৃপ্তির শিক্ষা

আসহাবে সুফফার জীবনে ‘এক পেয়ালা দুধ’ একটি কিংবদন্তিতুল্য ঘটনা, যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখানে এর ভিন্ন একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা হলো তৃপ্তি ও বারাকাহর শিক্ষা। হাদিসটির বিস্তারিত বর্ণনা সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদিন ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি পথে বসে আছেন। রাসূল (সা.) যাওয়ার সময় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, এবং ইশারায় তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে এক পেয়ালা দুধ ছিল, যা কেউ হাদিয়া দিয়েছিলেন (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২; মুসলিম, হাদীস: ১৭২৭)।

রাসূল (সা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললেন, “যাও, সুফফার সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো।” আবু হুরায়রা (রা.)-এর মনে তখন এক দ্বন্দ্ব চলছিল। তিনি নিজে ছিলেন ভীষণ ক্ষুধার্ত। তাঁর মনে হলো, এক পেয়ালা দুধে এত মানুষের কী হবে? কিন্তু শিক্ষকের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে তিনি কোনো দ্বিধা প্রকাশ না করে সবাইকে ডেকে আনলেন। সত্তর বা তার বেশি লোক এসে রাসূল (সা.)-এর ঘরে বসলেন। রাসূল (সা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে আদেশ করলেন পেয়ালাটি তাদের মাঝে ঘুরিয়ে দিতে। তিনি একে একে সবাইকে পান করাতে লাগলেন। অলৌকিকভাবে, প্রত্যেক সাহাবি তৃপ্তি সহকারে পান করলেন, অথচ পেয়ালার দুধ শেষ হলো না। শেষ পর্যন্ত যখন পেয়ালা রাসূল (সা.)-এর হাতে এলো, তখনো তাতে দুধ অবশিষ্ট ছিল। তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললেন, “এবার তুমি পান কর।” তিনি পান করলেন। রাসূল (সা.) বলতে থাকলেন, “আরো পান কর,” যতক্ষণ না আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, “যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আমার পেটে আর জায়গা নেই।” তারপর রাসূল (সা.) অবশিষ্ট দুধ পান করলেন (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২)।

এই মুজিজা থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। প্রথমত, এটি ছিল আসহাবে সুফফার প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমতের নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, এটি রাসূল (সা.)-এর বিনয় ও ভালোবাসার চরম প্রকাশ। তিনি নিজে না খেয়ে, নিজের মেহমানদের আগে খাওয়ালেন। তৃতীয়ত, এটি ‘বারাকাহ’ বা বরকতের একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। অল্প সম্পদেও আল্লাহর রহমতে কীভাবে তা বরকতময় হয়ে উঠতে পারে, তা এই ঘটনায় প্রতীয়মান হয়। চতুর্থত, ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর ধৈর্য ও আনুগত্য ছিল অনুকরণীয়। আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে ‘resource scarcity’ বা সম্পদের স্বল্পতা, তা আল্লাহর রহমতে ও পারস্পরিক ভাগাভাগির মাধ্যমে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সুফফার এই শিক্ষা তার এক চিরন্তন মডেল (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ১২০)।

সফরে ও বিপদে আসহাবে সুফফার সঙ্গ প্রাপ্তি

আসহাবে সুফফা শুধু মদিনার মসজিদেই রাসূল (সা.)-এর সঙ্গ লাভ করতেন না, বরং সফরে ও বিপদের সময়েও তারা তাঁর অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধে বা অভিযানে বের হতেন, তখন আসহাবে সুফফার অনেক সদস্য তাঁর

সাথে অংশগ্রহণ করতেন, যদিও তাদের কাছে যুদ্ধের সরঞ্জাম বা বাহনের ব্যবস্থা থাকত না।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) খাইবারের যুদ্ধের সময় দোয়া করেছিলেন। এই যুদ্ধে আসহাবে সুফফার অনেক সদস্য অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ খালি পায়ে যুদ্ধ করেছিলেন (বুখারি, হাদীস: ২৯০৪)। তাবুক যুদ্ধের সময়, যা ছিল 'জাইশ আল-উসরা' বা কষ্টের বাহিনী, তখন আসহাবে সুফফার কয়েকজন সাহাবি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বাহনের ব্যবস্থা করার আবেদন জানান, কিন্তু রাসূল (সা.)-এর কাছে কিছুই ছিল না। তাদের কথা পবিত্র কোরআনে এসেছে: "তাদেরও কোনো অপরাধ নেই, যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, 'আমি তো তোমাদের জন্য কোনো বাহন পাচ্ছি না'। তারা ফিরে যায় আর তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় এই দুঃখে যে, তাদের ব্যয় করার কিছু নেই" (সূরা আত-তাওবা: ৯২)। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (রহ.) উল্লেখ করেন, এই আয়াতটি আবু লাইলা আব্দুর রহমান ইবনে কাব (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-সহ সাতজন আসহাবে সুফফার সদস্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ৪/১৬২)।

এছাড়া, হুদাইবিয়ার সন্ধির মতো রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণেও আসহাবে সুফফা রাসূল (সা.)-এর পাশে ছিলেন। তাদের সর্বদা সাহচর্য ছিল রাসূল (সা.)-এর জন্য এক প্রকার সান্ত্বনা ও শক্তির উৎস। ঐতিহাসিক আল-বালাযুরি বলেন, "আসহাবে সুফফা ছিল রাসূল (সা.)-এর ছায়াসঙ্গী, যারা প্রতিটি সুখে-দুঃখে, শান্তিতে-যুদ্ধে, তার সাথে থাকতেন" (আল-বালাযুরি, ১৯৯৬: ১/২০৬)।

সমসাময়িক উদাহরণ ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

রাসূল (সা.) ও আসহাবে সুফফার এই সম্পর্ক আমাদের আজকের দিনে শেখায়, একজন শিক্ষক বা নেতার সাথে তার অনুসারীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। আধুনিক কর্পোরেট জগতে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতা বা শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যে ব্যবধান, যে আবেগহীনতা, তা ভাঙার প্রয়োজনীয়তা এখান থেকে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের উচিত, আমাদের জীবনে 'সুফফার মতো' একটি ঘনিষ্ঠ বৃত্ত তৈরি করা, যেখানে আমরা পরস্পরের সাথে ভালোবাসা, খাদ্য ও সময় ভাগ করে নিতে পারি। যেমন,

সপ্তাহে অন্তত একদিন বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশীদের নিয়ে একসাথে বসে খাওয়া, তাদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ানো, এবং নিজেদের মধ্যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা তৈরি করা।

অধ্যায় ১০: ক্ষুধা, কষ্ট ও প্রাপ্তির উপাখ্যান

আসহাবে সুফফার জীবন ছিল চরম দারিদ্র্য ও কষ্টের জীবন। কিন্তু এই কষ্ট ও ক্ষুধাই তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিল এবং তাদের ঈমানকে করেছিল ইস্পাত কঠিন। তাঁদের কষ্টের উপাখ্যানগুলি শুধু ইতিহাসের অধ্যায় নয়, এগুলো আমাদের জন্য এক একটি প্রেরণার বাতিঘর।

আবু হুরায়রা (রা.)-এর পেটে পাথর বাঁধার মর্মস্পর্শী বর্ণনা

আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনাগুলোতে আসহাবে সুফফার ক্ষুধার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা মানব ইতিহাসে বিরল। তিনি বলেন, "আমি আসহাবে সুফফার সত্তরজনকে দেখেছি, যাদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়তো ছিল কেবল তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর, যা তারা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। কারো পায়ের নিসফে সাক (অর্ধ-হাঁটু) পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছাত। তারা লজ্জা-স্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।" (বুখারি, হাদীস: ৪৪২)

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই! আমি ক্ষুধার জ্বালায় নিজের পেট মাটিতে চেপে ধরে থাকতাম এবং কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম, যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি।" (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২; তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮, হাসান সহীহ)

এই বর্ণনা শুধু একজনের ক্ষুধার কথা নয়, এটি ছিল একটি গোটা সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র। কেন তারা পেটে পাথর বাঁধতেন? চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, তীব্র ক্ষুধার সময় পেটের অভ্যন্তরীণ প্রাচীর গুলো সংকুচিত হয়ে যায় এবং প্রচন্ড ব্যথা সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে শক্ত কিছু চেপে ধরলে সেই ব্যথা কিছুটা লাঘব হয় (ইবনে কাইয়্যিম, ২০০৩: ১৬৮)। আবু হুরায়রা (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা এই কষ্ট নীরবে সহ্য করতেন, কখনো কারো কাছে হাত পাততেন না।

একদিন আবু হুরায়রা (রা.) প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাস্তায় বসে ছিলেন। আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) পাশ দিয়ে গেলেও তারা তাঁর অবস্থা বুঝতে পারেননি। কিন্তু যখন রাসূল (সা.) এলেন, তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই মুচকি হাসলেন এবং পুরো

পরিস্থিতি বুঝতে পারলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "তিনি আমাকে 'আবা হুরায়রা' (হে হুরায়রার পিতা) বলে ডাকলেন। আমি বললাম, 'লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ'। তিনি বললেন, 'আমার সাথে চলো'।" (বুখারি, হাদীস: ৬৪৫২)

এই ঘটনা থেকে আমরা শিখি, প্রকৃত নেতা ও শিক্ষক কখনো তার অনুসারীদের কষ্ট উপেক্ষা করেন না। রাসূল (সা.)-এর সেই মুচকি হাসির পেছনে ছিল তাঁর গভীর সহমর্মিতা, ভালোবাসা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা।

নামাজে বেহুঁশ হয়ে পড়ার ঘটনা ও বেদুঈনদের ভুল ধারণা

আসহাবে সুফফার ক্ষুধার কষ্ট এতটাই তীব্র ছিল যে, কখনো কখনো তাঁরা নামাজরত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। হজরত ফাদ্বালাহ ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন লোকদের নামাজ পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফফা। এমনকি মরুবাসী বেদুঈনরা বলত, 'এরা পাগল'।" (তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮; আহমদ, হাদীস: ২৩৪২০)

এই বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। যারা আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, যারা জ্ঞানার্জনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন, সেই মহামানবদেরকে সমাজের কিছু লোক 'পাগল' বলত! ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রহ.) বলেন, "মক্কা-মদিনার বাইরের বেদুঈনরা যারা মসজিদে নববীর পরিবেশের সাথে পরিচিত ছিল না, তারা আসহাবে সুফফার কৃশকায় দেহ ও ক্লান্ত ভাব দেখে মনে করত এরা উন্মাদ। কিন্তু রাসূল (সা.) তাদের মর্যাদা বুঝতেন" (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ১/২৫৮)।

আধুনিক সমাজেও আমরা এই প্রবণতা দেখতে পাই। যারা সমাজের মূলধারার বাইরে গিয়ে আত্মত্যাগের জীবন বেছে নেন, যারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে গিয়ে আত্মিক উন্নতির দিকে মনোযোগী হন, তাদেরকেও অনেকে 'একঘরে' করে রাখে বা 'অপার্থিব' বলে উপহাস করে। আসহাবে সুফফার এই ঘটনা আমাদের শেখায়, আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করা এবং মানুষের উপহাস উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা হল প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক।

রাসূল (সা.)-এর সান্ত্বনা: "তোমরা জানতে পারলে আরও দারিদ্র্য কামনা করতে"

এই তীব্র দারিদ্র্য ও কষ্টের মাঝেও আসহাবে সুফফার জন্য অপেক্ষা করছিল এক মহা সুসংবাদ। একদিন রাসূল (সা.) নামাজ শেষ করে তাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চেয়েও বেশি অভাব ও দারিদ্র্য পছন্দ করতে।" (তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮; আহমদ, হাদীস: ২৩৪২০)।

এই হাদিসটি সুফফার শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল পরম সান্ত্বনার উৎস। এটি তাদেরকে মনে করিয়ে দিত যে, তাদের এই ক্ষুধা, এই অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা, এই অর্ধাহারে থাকা এসবই অস্থায়ী এবং এর প্রতিদান আখিরাতে এত বেশি যে, যদি তারা তা জানতেন, তাহলে আরও দারিদ্র্য কামনা করতেন। এই কথাগুলো তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিত এবং তাদেরকে দ্বীনের পথে অটল থাকার শক্তি জোগাত (আল-জুহাইলি, ২০০২: ২/১৮০৪)।

পবিত্র কোরআনের আয়াতও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: "আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু না কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও" (সূরা আল-বাকারা: ১৫৫)। আসহাবে সুফফা ছিলেন এই 'সাবিরিন' বা ধৈর্যশীলদের জ্বলন্ত উদাহরণ।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আজকের যুগে আমরা সামান্য কষ্টে অধৈর্য হয়ে পড়ি। পেটে একটু ক্ষুধা লাগলে পরিবারের ওপর রেগে যাই। জীবনের সামান্য অভাব-অনটনে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ জমা করি। অথচ আসহাবে সুফফার জীবন আমাদের শেখায়, প্রকৃত ঈমানদার কখনো কষ্টের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। আমাদের উচিত, মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় উপবাস রাখা বা সাধারণ জীবনযাপনের চর্চা করা, যাতে আমরা তাদের সেই ত্যাগের মানসিকতা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারি। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য জাগরণ, ইবাদত ও ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকা, এবং আল্লাহর ভরসায় নিজের ভবিষ্যতের ভার অর্পণ করার শিক্ষা আমরা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি।

অধ্যায় ১১: আনসারদের বদান্যতা ও ভ্রাতৃত্বের গল্প

আসহাবে সুফফার জীবনের কষ্টের চিত্র যতটা মর্মস্পর্শী, ততটাই হৃদয়গ্রাহী ছিল মদিনার আনসার সাহাবিদের বদান্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের গল্প। একদিকে গৃহহীন, নিঃস্ব একদল মুহাজির, অন্যদিকে মদিনার ধনী ও কৃষিজীবী আনসার এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝে ইসলাম যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছিল, তা মানব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সাদ ইবনে উবাদা (রা.)-এর একাই ৮০ জনকে মেহমানদারি করার ঘটনা

আনসারদের মধ্যে খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদা (রা.) ছিলেন অন্যতম ধনী ও দানশীল সাহাবি। তিনি ছিলেন সেই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের সমস্ত সম্পদ রাসূল (সা.)-এর ইশারায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন। আসহাবে সুফফার প্রতি তাঁর বদান্যতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়, যখন সন্ধ্যা হতো, সাদ (রা.)-এর বাড়ির আঙিনায় আশি জন বা তারও বেশি আসহাবে সুফফা একত্রিত হতেন, এবং তিনি তাদের পেট পুরে খাইয়ে তবেই শান্তি পেতেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/৬১৫; আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৪৬)।

সাদ (রা.) শুধু খাওয়াতেনই না, তিনি তাদের জন্য ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থাও করতেন। ইতিহাসবিদ ইবনে আব্দুল বার (রহ.) ‘আল-ইস্তিয়াব’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “সাদ (রা.)-এর বাড়ি ছিল মদিনার বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এর মতো, যেখান থেকে কখনো দানের ধারা থামত না। তিনি আসহাবে সুফফাকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির দরজা আসহাবে সুফফার জন্য উন্মুক্ত থাকত।” (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ২/৫৯৫)।

এই বদান্যতা শুধু সাদ (রা.)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আনসার সাহাবিদের অধিকাংশই আসহাবে সুফফার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন। তাঁরা মুহাজির ভাইদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিতেন। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন: “আর তারা (আনসাররা) নিজেদের ওপর তাদের (মুহাজিরদের) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত। এবং যাদের মন সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই সফলকাম।” (সূরা আল-হাশর: ৯)। ইমাম

কুরতুবী (রহ.) তাঁর তাফসীরে বলেন, এই আয়াতটি আনসারদের বিশেষত্ব ও মুহাজিরদের প্রতি তাদের ভালোবাসার ওপর আলোকপাত করে (কুরতুবী, ২০০৩: ১৮/২০)।

ধনী সাহাবিদের রাতে সুফফাবাসীদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা

আসহাবে সুফফার দেখভালের জন্য রাসূল (সা.) একটি নিয়মিত ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বিকেল বা সন্ধ্যার পর রাসূল (সা.) আসহাবে সুফফার সদস্যদের ধনী সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) সাহাবিদের মধ্যে আসহাবে সুফফাকে ভাগ করে দিতেন এভাবে যে, যার কাছে দুজনের খাবার আছে সে একজনকে এবং যার কাছে তিনজনের খাবার আছে সে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।" (বুখারি, হাদীস: ৬০২, পরিচ্ছেদ-৩৬)

মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ.) বলেন, "যখন সন্ধ্যা হতো, রাসূল (সা.) আসহাবে সুফফার সদস্যদেরকে অন্য সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কেউ দুজন, কেউ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর সাদ ইবনে উবাদা (রা.) একাই আশিজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং মেহমানদারি করাতেন।" (ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার, ১১/২৮৬; আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৪৬)

এই চিত্রটি আমাদের সামনে একটি জীবন্ত ভ্রাতৃত্বের ছবি তুলে ধরে। এখানে কেউ একা খায় না। যার যা আছে, তা ভাইয়ের সাথে ভাগ করে খাওয়া হয়। একবার রাসূল (সা.) বলেন, "যার খাদ্য দুজনের জন্য যথেষ্ট, সে যেন তৃতীয়জনকে নেয়। আর যার খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজনকে নেয়।" (বুখারি, হাদীস: ৫৩৯২; মুসলিম, হাদীস: ২০৫৯)। এই নির্দেশনা ও চর্চা মদিনার সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি চমৎকার প্রাকৃতিক পদ্ধতি তৈরি করেছিল।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এটি ছিল এক ধরণের 'কমিউনিটি কেয়ার নেটওয়ার্ক', যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজের দুর্বল সদস্যদের দেখভাল করা হতো। কোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় জটিল ব্যবস্থা ছাড়াই, একমাত্র ঈমান ও ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়া চলত (Watt, ১৯৫৬: ৭৮)। এটি ছিল নাগরিক সমাজের এক অনন্য মডেল।

মসজিদের ছাদে ফলের থোকা ঝোলানোর রীতি ও রাসূলের (সা.) তদারকি

মসজিদে নববীর দুটি খুঁটির মধ্যে একটি রশি বাঁধা থাকত। আনসার সাহাবিরা তাদের বাগান থেকে তাজা ফলের থোকা এনে সেই রশিতে ঝুলিয়ে রাখতেন আসহাবে সুফফার জন্য। তাঁরা তা নামিয়ে খেতেন (আল-ওয়াফা, ১/৩২৪; ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ১/২৫৬)।

হজরত আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (সা.) মসজিদে এলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি দেখলেন, রশিতে একটি নষ্ট (পচা) খেজুরের থোকা ঝুলছে। তিনি সেই নষ্ট থোকায় লাঠি লাগিয়ে বললেন, "এই সদকাকারী যদি চাইত, তাহলে এর চেয়ে ভালো থোকা সদকা করতে পারত।" (নাসাঈ, হাদীস: ২৫২৪; আহমদ, হাদীস: ১৭৬৪৭)। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) শুধু আসহাবে সুফফার দেখভালকেই গুরুত্ব দিতেন না, বরং তাদের জন্য প্রদত্ত জিনিসের মানও তদারকি করতেন। তিনি চাইতেন, আসহাবে সুফফার মতো মেহনতী ও ত্যাগী শিক্ষার্থীদের জন্য যেন ভালো ও উত্তম খাদ্য প্রদান করা হয়।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এই ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করতেন (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৪২)। আরেক হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, "প্রত্যেক বাগানের মালিক একটি করে থোকা এনে দরিদ্রদের জন্য ঝুলিয়ে রাখবে" (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৮২১, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে; ইবনে হাজার আসকালানি, ২০০১: ৩/৩৩৩)। হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রতি দশটি থোকার মধ্য থেকে একটি থোকা মসজিদে এনে মিসকীনদের জন্য রেখে দেওয়া জরুরি" (তাবারানি, আল-মু'জাম আল-আওসাত, হাদীস: ৩৭৮১; হাইসামি, ১৯৯৪: ৩/১২০)।

এই 'ফলের থোকা ঝোলানোর রীতি' ছিল একটি সুন্দর সামাজিক চুক্তির অংশ। এটি ছিল এক দিকে আনসারদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম, অন্যদিকে আসহাবে সুফফার জন্য এক প্রকার নিয়মিত ভাতা। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি, সমাজের বিত্তবানদের উচিত নিজেদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী ও অভাবগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দ রাখা, এবং তা এমনভাবে করা যাতে গ্রহীতার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়।

সমসাময়িক উদাহরণ ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমাদের সমাজে আজও কিছু মানুষ আছেন, যারা নীরবে দান করে যান। কিন্তু আনসারদের এই বদান্যতা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মিত। আমাদের উচিত, ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেন আমাদের আশেপাশের কোনো মাদরাসা বা এতিমখানার দায়িত্ব নিই, অথবা কোনো দরিদ্র ছাত্রের পড়াশোনার খরচ বহন করি। আমরা ইচ্ছা করলে বছরে কয়েকবার আমাদের ফসল, বেতন বা ব্যবসার লাভের একটি অংশ নিয়মিতভাবে কোনো দরিদ্র শিক্ষার্থী বা অভাবী প্রতিবেশীর জন্য বরাদ্দ করতে পারি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, আমরা আসহাবে সুফফার কতজন আধুনিক উত্তরসূরির পাশে দাঁড়াতে পারি এক বছর?

অধ্যায় ১২: আবু হুরায়রা (রা.): সুফফার সেরা প্রতিনিধি

আসহাবে সুফফার যে অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র ইতিহাসের আকাশে জ্বলজ্বল করছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হলেন হজরত আবু হুরায়রা (রা.)। তিনি কেবল সুফফার সদস্যই ছিলেন না, বরং তিনিই ছিলেন সুফফা চত্বরের চেতনার মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবন, তাঁর জ্ঞানার্জনের নিষ্ঠা, এবং তাঁর বর্ণিত হাদিসের ভাণ্ডার সুফফার আদর্শকে চিরকালের জন্য অমর করে রেখেছে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, "আবু হুরায়রা (রা.) হলেন হাদিস বর্ণনাকারীদের সর্দার এবং হিফজের পাহাড়" (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৫৭৮)।

সুফফার সদস্য হিসেবে তাঁর জীবন ও একনিষ্ঠতা

আবু হুরায়রা (রা.)-এর আসল নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে সাখর আদ-দাওসি। প্রায় ৭ম হিজরিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করে আসেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি আসহাবে সুফফার সাথে যুক্ত হয়ে যান এবং আমৃত্যু এই পরিচয়কে তিনি নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান বলে মনে করতেন (ইবনে হাজার আসকালানি, ১৯৯৮: ৭/৩১৬)।

তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি আসহাবে সুফফার একজন ছিলাম। আমরা যখন সন্ধ্যা করতাম, তখন রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হতাম। তিনি আমাদের ধনী সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এরপর যারা বাকি থাকতেন, তিনি তাদের নিজের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করাতেন।" (বুখারি, হাদীস: ৬০২)। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি আমার পেট ভরে খেতাম না, যতক্ষণ না রাসূল (সা.) আমাদের কিছু খেতে দিতেন।" (আহমদ, হাদীস: ৮৬০৫)

তাঁর একনিষ্ঠতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন: "লোকেরা বলে, আবু হুরায়রা অনেক হাদিস বর্ণনা করে। কিন্তু মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আনসার ভাইয়েরা খেজুর-বাগানে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ছিলাম একজন মিসকীন, যিনি পেটের তাগিদে রাসূল (সা.)-এর সাথে লেগে থাকতাম। তাই আমি তখন উপস্থিত থাকতাম, যখন তারা অনুপস্থিত থাকতেন।

আর আমি মনে রাখতে পারতাম, যখন তারা ভুলে যেতেন।" (বুখারি, হাদীস: ১১৮; মুসলিম, হাদীস: ২৪৯২)।

এই বর্ণনা থেকে আমরা আবু হুরায়রা (রা.)-এর মনোজগতের গভীরতা বুঝতে পারি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্যবসা বা কৃষিকাজ করে পার্থিব সম্পদ অর্জন করা গেলে তা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর জ্ঞান ও বাণী সংরক্ষণ করা হলো এমন এক সম্পদ, যা পৃথিবীর কোনো বাজারে কেনাবেচা সম্ভব নয়। এই প্রজ্ঞাই তাঁকে দিয়েছিল এক অমরত্ব।

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনার পেছনে সুফফার ভূমিকা

আবু হুরায়রা (রা.) প্রায় ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণনা করেছেন (ইবনে হাজার আসকালানি, ১৯৯৮: ৭/৩১৮)। এত অল্প সময়ে (প্রায় তিন বছর) এত বিশাল সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার পেছনে সুফফার জীবনপদ্ধতি ছিল প্রধান নিয়ামক। তিনি নিজের সবকিছু ছেড়ে শুধু জ্ঞানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তিনি বলতেন, "আমি রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য থেকে একটি মুহূর্তও বিচ্ছিন্ন থাকিনি।" (মুসলিম, হাদীস: ২৪৯২)। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "আবু হুরায়রা (রা.)-এর মেধা ও স্মৃতিশক্তি আল্লাহর এক বিশেষ দান ছিল। কিন্তু এর পেছনে ছিল তাঁর নিরলস পরিশ্রম, কঠোর ত্যাগ এবং নবীর (সা.) প্রতি অগাধ ভালোবাসা।" (ইবনে তাইমিয়া, ১৯৮৭: ১৩/৩৭২)।

একবার মারওয়ান ইবনে হাকাম আবু হুরায়রা (রা.)-এর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে কিছু হাদিস লিখতে বললেন। এক বছর পর তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কে ডেকে সেই হাদিসগুলো আবার তিলাওয়াত করতে বললেন। আবু হুরায়রা (রা.) অবিকল সে হাদিসগুলো বর্ণনা করলেন, একটি শব্দেরও হেরফের হয়নি (বুখারি, হাদীস: ১১৮)। এতে বোঝা যায়, তাঁর মুখস্থ করার ক্ষমতা ছিল অলৌকিক পর্যায়ের।

কিন্তু এই স্মৃতিশক্তি কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া ছিল না; এর পেছনে ছিল রাসূল (সা.)-এর একটি বিশেষ দোয়া। একবার আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে নিজের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলে, রাসূল (সা.) তাঁর চাদর বিছিয়ে দিতে বলেন। তারপর তিনি তাতে অদৃশ্য কিছু রাখেন এবং বললেন, "এটা তোমার বুকে

জড়িয়ে নাও।” আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, “আমি তা জড়িয়ে নিলাম। এরপর আর কোনো কিছুই আমি ভুলিনি।” (বুখারি, হাদীস: ১১৯; মুসলিম, হাদীস: ২৪৯২)।

তাঁর স্মৃতিশক্তি, দারিদ্র্য ও অমরত্ব লাভের কাহিনি

আবু হুরায়রা (রা.)-এর স্মৃতিশক্তি এবং তাঁর বর্ণিত হাদিসের ভাণ্ডার তাঁকে ইসলামী জ্ঞানের জগতে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। কিন্তু এই পথ সহজ ছিল না। তাঁকে অনেকের কাছ থেকে সমালোচনা ও অবিশ্বাসের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সবকিছু ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন।

তিনি বলতেন, “তোমরা বলো, আবু হুরায়রা অনেক হাদিস বর্ণনা করে। আর আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী। আমি ছিলাম একজন মিসকীন, আমি রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে পেট ভরে খেতে পেতাম।” (বুখারি, হাদীস: ১১৮)। একবার উমর (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, “হে আবু হুরায়রা! তুমি কি রাসূল (সা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে, নাকি আমি তোমাকে দাওস গোত্রের দেশে নির্বাসিত করব?” (ইবনে হাজার আসকালানি, ১৯৯৮: ৭/৩১৭)। কিন্তু পরবর্তীতে উমর (রা.) যখন নিজে কিছু হাদিসের সত্যতা যাচাই করতে চাইতেন, তখন তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কেই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন, “তুমি রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি ছিলে এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস মুখস্থ রেখেছ।” (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৪/৩৪০)।

আবু হুরায়রা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর জানাজায় উপস্থিত হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-সহ বহু বিশিষ্ট সাহাবি ও তাবেয়ি। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেইসব হাদিসের জ্ঞান দান করার জন্য শোকর আদায় করছি, যা তুমি আমাকে দিয়েছ।” (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৬৩০)। আজ তিনি শুধু একজন সাহাবি নন, বরং তিনি ‘রাউই আল-ইসলাম’ বা ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

তিনি সত্তর জনেরও বেশি তাবেয়ি ছাত্র রেখে গেছেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন (ইবনে হাজার আসকালানি,

২০০১: ৭/৩৩০)। তাঁর এই অমরত্বের রহস্য একটাই দারিদ্র্য, ত্যাগ, জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা এবং সর্বোপরি রাসূল (সা.)-এর প্রতি সুগভীর প্রেম।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আবু হুরায়রা (রা.)-এর জীবনী আমাদের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়: আমরা আমাদের জীবন দিয়ে কী রেখে যেতে চাই বিত্তের পাহাড়, নাকি জ্ঞানের এক অমর উত্তরাধিকার? আজকের ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা সবাই কন্টেন্ট তৈরি করি, কিন্তু আমাদের বিষয়বস্তু কী? আমরা কি এমন কিছু তৈরি করছি, যা আমাদের মৃত্যুর পরও ইলম হিসেবে বহমান থাকবে এবং আমাদের আমলনামায় সওয়াব জমা হতে থাকবে? আবু হুরায়রা (রা.)-এর জীবনী থেকে আমরা শিখতে পারি, জ্ঞান অর্জন ও বিতরণই পারে একটি মানুষকে সত্যিকার অর্থে অমর করতে। আসুন, আমরা আমাদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় প্রতিদিন হাদিস পড়া ও মুখস্থ করার জন্য নির্ধারিত করি এবং নিজেদের পরিবারে একটি ‘হাদিস শিক্ষার চক্র’ গড়ে তুলি।

চতুর্থ পর্ব: কর্ম ও প্রভাবে আসহাবে সুফফা

জ্ঞান আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো, যাকে পৃথিবীতে নেমে এসে ফসল ফলাতে হয়। আসহাবে সুফফা শুধু মসজিদের ছাউনির নিচে বসে তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং প্রশিক্ষণ শেষে তারা রাসূল (সা.)-এর আদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পারস্যের প্রান্তরে, সিরিয়ার শহরগুলোতে এবং ইয়েমেনের গিরিপথে। তাঁরা গিয়েছিলেন শিক্ষক হয়ে, বিচারক হয়ে, প্রশাসক হয়ে এবং প্রয়োজনে তরবারি হাতে সৈনিক হয়ে। এই পর্বে আমরা আলোচনা করব কীভাবে সুফফার এই সোনার ফসল বাইরের জগতে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছিল, এবং কীভাবে তাঁদের জীবনাচার আজকের দিনেও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক অনুপ্রেরণা।

অধ্যায় ১৩: সুফফার প্রতিনিধি দল, দূর-দূরান্তে জ্ঞানের আলো

ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্র সম্প্রসারণের ইতিহাসে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হলো প্রাথমিক পর্যায়ের মানবসম্পদের অসাধারণ গুণগত মান। এই মানবসম্পদের একটি বড় অংশ গড়ে উঠেছিল সুফফা চত্বরের পাঠশালায়। রাসূল (সা.) এই ত্যাগী ও মেধাবী দলটিকে কেবল নিজের কাছে আটকে রাখেননি; বরং তাদের তৈরি করেছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড হিসেবে এবং একে একে দূর-দূরান্তের প্রদেশ ও জাতির কাছে পাঠিয়েছিলেন দীনের আলো ছড়িয়ে দিতে। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, "রাসূল (সা.) আসহাবে সুফফাকে ইসলামী জ্ঞানের বাহক ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন" (ইবনে কাইয়্যিম, ২০০৫: ২/২৪৫)।

শিক্ষক, বিচারক ও প্রশাসক হিসেবে তাদের নিয়োগ

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই আসহাবে সুফফার সদস্যরা বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক, বিচারক ও প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেতে শুরু করেন। এটি ছিল একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ, কারণ প্রাক-ইসলামী আরবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ধারণা ছিল না, আর যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগের তো প্রশ্নই উঠত না। রাসূল (সা.) গোত্রীয় আভিজাত্যের পরিবর্তে জ্ঞান, তাকওয়া ও যোগ্যতাকে নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন, আর এর সবচেয়ে বড় সুফলভোগী হলো এই সুফফার ইলম-পিপাসু তরুণেরা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর ইয়েমেনে প্রেরণ। রাসূল (সা.) যখন তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর, বিচারক ও শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে মুয়াজ! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার করবে?" মুয়াজ (রা.) উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে।" রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি তাতে না পাও?" তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে।" রাসূল (সা.) আবার বললেন, "যদি তাতেও না পাও?" মুয়াজ (রা.) বললেন, "তাহলে আমি আমার নিজস্ব ইজতিহাদ (গবেষণা) করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।" এই শুনে রাসূল (সা.) অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন, "সকল প্রশংসা

সেই আল্লাহর, যিনি রাসূলের প্রতিনিধিকে রাসূল যা পছন্দ করেন তার প্রতি সফলতা দান করেছেন” (আবু দাউদ, হাদীস: ৩৫৯২; তিরমিযি, হাদীস: ১৩২৭, হাসান সহীহ)।

মুয়াজ (রা.) ইয়েমেনে গিয়ে কেবল শাসকই হননি, বরং তিনি সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর অধীনে ইয়েমেনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোরআন ও সুন্নাহর নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা চালু হয়। পরবর্তীকালে ইয়েমেন থেকে যে বিশাল আলেম ও ফকিহগণের ধারা বের হয়, তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন এই সুফফা-শিক্ষিত মুয়াজ (রা.) (আল-জুহাইলি, ২০০২: ২/১৮১৫)।

অপরদিকে, হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-কে রাসূল (সা.) মুনাফিকদের তালিকা সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় গোপনীয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন (বুখারি, হাদীস: ৩২৬৪; মুসলিম, হাদীস: ২৭৭০)। পরবর্তীতে খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে তিনি পারস্যের মাদায়েন (সিটেসিফোন) শহরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামলে তিনি পারস্যের নবমুসলিমদের জন্য মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুফফা-শিক্ষিত কুরআনের মুফাসসিরদের সেখানে নিয়ে আসেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৬/১৫)।

একইভাবে, আবু দারদা (রা.)-কে খলিফা উসমান (রা.)-এর সময়ে দামেস্কের প্রধান বিচারপতি (কাজি) ও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। দামেস্কের কেন্দ্রীয় মসজিদে তিনি জ্ঞানের একটি বিশাল হালাকা (আলোচনা চক্র) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে প্রতিদিন কোরআন, হাদিস ও ফিকহের পাঠদান চলত। ইতিহাসবিদ ইবনে আসাকির (রহ.) ‘তারীখ মাদিনাত দিমাশক’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “আবু দারদা (রা.)-এর পাঠচক্রে একসাথে কয়েক হাজার তাবেয়ি উপস্থিত হতেন, এবং তিনি কোরআনের তিলাওয়াত এমন সুন্দর করে শেখাতেন যে, তার ছাত্রদের দ্বারা সিরিয়ায় তাজবিদের একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়” (ইবনে আসাকির, ১৯৯৫: ২৪/১৬০)।

কীভাবে তারা প্রদেশে প্রদেশে রিসালাতের শিক্ষা পৌঁছে দিতেন

সুফফা থেকে প্রশিক্ষিত এই প্রতিনিধিরা শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন না, বরং তাদের মূল পরিচয় ছিল দ্বীনের শিক্ষক হিসেবে। তারা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন নতুন অঞ্চলে ইসলামের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতেন। প্রথমত, তারা

সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতেন। মসজিদই হতো তাদের অপারেশনের কেন্দ্র। দ্বিতীয়ত, তারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে থেকে মেধাবী ও আগ্রহী ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন, যা ছিল 'ট্রেন দ্য ট্রেইনার' মডেলের একটি প্রাচীন রূপ (হামিদুল্লাহ, ২০০৩: ১৭৫)। তৃতীয়ত, তারা সরাসরি জনগণের সাথে মিশে যেতেন, তাদের ভাষা শিখতেন, তাদের রীতিনীতি বুঝতেন এবং স্থানীয় বাস্তবতায় ইসলামের সার্বজনীন মূল্যবোধ প্রয়োগ করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে খলিফা উমর (রা.) কুফা শহরে প্রেরণ করেছিলেন শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে। সেখানে গিয়ে তিনি কুফার মসজিদকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করলেন। ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, "ইবনে মাসউদ (রা.) কুফায় যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন, তার ফলে সেখান থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতো ফিকহবিদ ও ইমাম আ'মাশ (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিস জন্ম নিয়েছিলেন" (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৩৫৫)। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাতে গড়া কুফার এই মাদরাসা ছিল সুফফা শিক্ষার এক সরাসরি সম্প্রসারণ।

তেমনি, আবু মুসা আশআরি (রা.) বসরা শহরে প্রেরিত হন। যদিও তিনি সুফফার স্থায়ী সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি ও রাসূল (সা.)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতা সুফফার আদর্শেই গড়া ছিল। বসরায় তিনি যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন, তা থেকেই পরবর্তীকালে হাসান বসরি (রহ.)-এর মতো প্রজ্ঞাবান তাবেয়ি ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে (আল-বালাযুরি, ১৯৮৮: ৩৪৭)।

সুফফা-শিক্ষিত গভর্নর ও কমান্ডারদের কীর্তি

সুফফার অনেক শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনে কেবল শিক্ষক বা বিচারকই হননি, বরং তারা হয়েছিলেন বিশাল প্রদেশের গভর্নর ও সেনাবাহিনীর কমান্ডার। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)। তিনি ছিলেন 'আশারা মুবাশশারা' বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির একজন এবং কাদিসিয়ার যুদ্ধের নায়ক। ইরানের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন যার হাত ধরে, সেই সা'দ (রা.) ছিলেন সুফফার মজলিসের একজন নিয়মিত ছাত্র (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৮)। তিনি পারস্যের মাদায়েন বিজয়ের পর সেখানে ইসলামী প্রশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল সুফফার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফসল।

আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা.) ছিলেন আরেকজন কীর্তিমান গভর্নর ও সেনাপতি। রাসূল (সা.) তাঁকে 'উম্মতের আমিন' (আমিন আল-উম্মাহ) উপাধি দিয়েছিলেন (বুখারি, হাদীস: ৩৭৪৪; মুসলিম, হাদীস: ২৪১৯)। তিনি সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের জন্য এক অনন্য ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন কায়েম করেন। তার শাসনামলে ভূমি কর ও সম্পদ বণ্টনের যে নীতি প্রবর্তিত হয়, তার পশ্চাতে ছিল সুফফায় অর্জিত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জ্ঞানের গভীর প্রভাব (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ১৫০)।

হজরত উমর (রা.)-এর ছোট ভাই জায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.) সুফফার সদস্য ছিলেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বীরত্ব ও ত্যাগ ছিল সে যুগের এক কিংবদন্তি (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/২৮০)। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সুফফার জ্ঞানের আলো শুধু বিচারকের আসন বা শিক্ষকের বেতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা যুদ্ধের ময়দানেও ইসলামের পতাকা সমুন্নত রেখেছিল।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমাদের কি এই গভীর উপলব্ধি আছে যে, প্রকৃত জ্ঞান কখনো ব্যক্তির কাছে আটকে রাখার জন্য নয়, বরং তা সমাজের সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য? আসহাবে সুফফার প্রতিনিধি দলের এই কীর্তি থেকে আমাদের শেখা উচিত, আমাদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা আমরা কীভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারি। একজন চিকিৎসক বছরে কয়েকদিন গ্রামের গরিব মানুষের বিনামূল্যে সেবা করতে পারেন, একজন শিক্ষক মেধাবী গরিব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পড়াতে পারেন, একজন আইনজীবী অসহায় বিচারপ্রার্থীকে ফ্রি লিগ্যাল এইড দিতে পারেন। এটি হবে আসহাবে সুফফার সেই 'দূর-দূরান্তে জ্ঞানের আলো' পৌঁছে দেওয়ার আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন।

অধ্যায় ১৪: কলম ও তরবারির মিলন, যুদ্ধক্ষেত্রে সুফফাবাসী

আসহাবে সুফফা ছিলেন একই দেহে জ্ঞানী ও যোদ্ধার এক অনন্য সম্মিলন। তাঁরা যেমন কলম ধরতেন, তেমনি প্রয়োজনে তরবারিও ধরতে জানতেন। তাদের নিকট ইলম ও জিহাদ ছিল একে অপরের পরিপূরক। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে আসহাবে সুফফার এই জ্ঞানী-সেনানীরা ইসলামের প্রথম যুদ্ধগুলোতে অংশ নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন এবং কীভাবে তাদের ইলম যুদ্ধের ময়দানেও পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

বদর, ওহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে তাদের বীরত্বগাথা

বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরীক্ষা। এই যুদ্ধে মোট ৩১৩ জন মুসলিম সৈনিক অংশ নেন, যাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন আসহাবে সুফফার সদস্য বা সুফফা-সংশ্লিষ্ট দরিদ্র মুহাজির (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/৬২২)। এদের মধ্যে ছিলেন মিকদাদ ইবনে আমর (রা.)-এর মতো নির্ভীক যোদ্ধা। বদর যুদ্ধের আগে রাসূল (সা.) যখন সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করছিলেন, তখন মিকদাদ (রা.) দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে সে কথা বলব না, যা বনি ইসরাইল তাদের নবী মুসা (আ.)-কে বলেছিল 'তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে আছি'। বরং আমরা বলছি, আপনি চলুন, আমরাও আপনার ডানে-বামে ও সামনে-পেছনে থেকে যুদ্ধ করব। যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রের দিকেও যান, আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব" (বুখারি, হাদীস: ৩৯৫২, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে; আহমদ, হাদীস: ৩৬৯৩)। মিকদাদ (রা.) এই সাহসী ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা পুরো বাহিনীর মনোবল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ওহুদের যুদ্ধ ছিল ইসলামী বাহিনীর জন্য একটি বড় বিপর্যয়ের মুহূর্ত, যখন রাসূল (সা.)-এর হুকুম অমান্য করে তীরন্দাজরা তাদের অবস্থান ছেড়ে দেওয়ায় কুরাইশরা পাল্টা আক্রমণ চালায়। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, সুফফার শিক্ষার্থী আবু দারদা (রা.), হানজালা ইবনে আবু আমির (রা.) সহ অনেকে নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে রাসূল (সা.)-এর চারপাশে

ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন (ওয়াকিদি, ১৯৮৯: ১/২৮০)। হানজালা (রা.) ওহুদের দিন শত্রুর সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন, এবং রাসূল (সা.) বলেছিলেন যে ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছেন (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ৩/৮৫)।

খন্দকের যুদ্ধে মাসউদ ইবনে রবী (রা.)-সহ অনেক আসহাবে সুফফা পরিখা খননের কাজে অংশ নেন এবং শীত ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেন। বরং, সেই কঠিন অবস্থায়ও যখন বড় বড় পাথর ভেঙে পরিখা খনন করতে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর পেটে পাথর বাঁধা ছিল, তখন সুফফার সদস্যরাই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন (বুখারি, হাদীস: ৪১০১; মুসলিম, হাদীস: ১৮০৩)।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক বিশেষজ্ঞ: সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হুজাইফা ইবনে ইয়ামান

সুফফা চত্বর শুধু আধ্যাত্মিক বা আইনী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না, এটি ছিল সামরিক কৌশলেরও একটি প্রশিক্ষণাগার। রাসূল (সা.) নিজে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি এবং তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে সামরিক বিজ্ঞানের বিশেষ পাঠ দিতেন। সুফফার দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ছিলেন এই সামরিক প্রশিক্ষণের ফসল।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন একাধারে একজন দক্ষ অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও কৌশলী সেনাপতি। রাসূল (সা.) ওহুদের যুদ্ধে তাঁর তীরন্দাজির প্রশংসা করে বলেছিলেন, "হে সা'দ! তীর ছোড়ো, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক" (বুখারি, হাদীস: ৪০৫৮; মুসলিম, হাদীস: ২৪১১)। আরবিতে 'ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি' (আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান) কথাটি ছিল আরবদের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান ও ভালোবাসার বহিপ্রকাশ। পরবর্তীকালে তিনি কাদেরিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান এবং ইরাকের ইসলামী শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর প্রশাসনিক ও সামরিক সাফল্য সুফফার শিক্ষারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ (নাজিবাবাদি, ২০০০: ২/৪২)।

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ছিলেন আরেকজন ব্যতিক্রমী সামরিক বিশেষজ্ঞ, যিনি একইসাথে রাসূল (সা.)-এর গোপনীয় সংবাদের রক্ষক ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-

এর কাছে মুনাফিকদের নাম জানতেন, যা রাসূল (সা.) আর কাউকে জানাননি (মুসলিম, হাদীস: ২৭৭০)। খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.) যখন শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরে খবর সংগ্রহের জন্য কাউকে পাঠাতে চাইলেন, তখন সবাই ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও হুজাইফা (রা.) স্বেচ্ছায় রাতের অন্ধকারে শত্রুশিবিরে গুপ্তচরবৃত্তি করতে যান এবং বিপুল সাহসিকতার সাথে সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে ফিরে আসেন (মুসলিম, হাদীস: ১৭৮৮)। এই বিশেষ দায়িত্বের জন্য রাসূল (সা.)-এর পছন্দের মানুষ ছিলেন তিনি, আর এই স্তরের আস্থা ও প্রশিক্ষণ তিনি পেয়েছিলেন সুফফার গোপনীয় মজলিস থেকেই।

যুদ্ধের ময়দানে ইলম ও আমলের সমন্বয়

আসহাবে সুফফার জীবনে ইলম ও আমলের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাদের জ্ঞান কখনো তাদের অস্ত্র ব্যবহারে দ্বিধাগ্রস্ত করেনি, আবার তাদের বীরত্ব কখনো তাদের জ্ঞানচর্চার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই সমন্বয়ই ছিল ইসলামী সভ্যতার প্রাণভোমরা।

যুদ্ধের ময়দানে তারা যে আচরণ করতেন, তাতে ইলমের ছাপ স্পষ্ট ছিল। তারা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র ধর্মযাজকদের হত্যা করতেন না, গাছপালা কাটতেন না, এবং চুক্তি ভঙ্গ করতেন না (মুসলিম, হাদীস: ১৭৩১; আবু দাউদ, হাদীস: ২৬১৩)। এই নিয়মগুলো তারা সরাসরি রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে শিখে এসেছিলেন। খাইবারের যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা ছিল, “যাও, আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করো না, অঙ্গহানি করো না, এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না” (মুসলিম, হাদীস: ১৭৩১)।

সুফফার আলেম-যোদ্ধারা যুদ্ধ শেষে আবার তাদের প্রধান কাজ শিক্ষাদানে ফিরে যেতেন। সা’দ (রা.) যখন কাদেরিয়া যুদ্ধ শেষে পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং তারপরের দিনই কোরআনের তাফসীরের একটি মজলিস কায়েম করলেন (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ৭/১৪৫)।

এই যে কলম ও তরবারির সমন্বয়, তা আধুনিক মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমরা এক চরম থেকে আরেক চরমে দুলি কেউ জ্ঞানী হয়ে সংগ্রাম

বিমুখ হই, কেউ আবার সংগ্রামী হয়ে জ্ঞানকে অবহেলা করি। অথচ আসহাবে সুফফা আমাদের দেখিয়েছেন, একজন মুমিন একইসাথে মুহাদ্দিস এবং মুজাহিদ হতে পারেন, একইসাথে কাজি (বিচারক) এবং কায়েদ (সেনাপতি) হতে পারেন।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমাদের জীবনে 'কলম ও তরবারির' এই মিলন কতটা আছে? আমরা যদি শিক্ষক হই, আমরা কি সমাজের জন্য লড়াই করা ছেড়ে দিয়েছি? আমরা যদি সমাজকর্মী বা আইনজীবী হই, তাহলে কি আমাদের জ্ঞানের গভীরতা আছে? আমাদের উচিত, নিজের পেশাগত দক্ষতা (কলম) ও সমাজের ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার মানসিকতার (তরবারি) মধ্যে একটা সুন্দর ভারসাম্য তৈরি করা। আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, কিন্তু একইসাথে জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে সত্যের পথ দেখাই।

অধ্যায় ১৫: তাসাউফের প্রথম পাঠশালা, আত্মশুদ্ধির বীজ বপন

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে 'তাসাউফ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যার কেন্দ্রীয় বার্তা হলো আত্মশুদ্ধি, ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা। যদিও তাসাউফ পরবর্তী যুগে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে, এর মূল উৎস ও ভিত নির্মিত হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই, আর সুফফা ছিল তার প্রধান চারণভূমি। ইমাম আল-কালাবাজি (রহ.)-এর ভাষায়, "তাসাউফের প্রথম পাঠশালা ছিল সুফফা, আর তার প্রথম ছাত্র ছিলেন আবু জর, বিলাল ও সালমান ফারসি (রা.)-এর মতো আত্মত্যাগী মনীষীরা" (আল-কালাবাজি, ১৯৯৩: ২২)।

'আসহাবে সুফফা' ও পরবর্তী 'সুফি'-দের মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র

'সুফি' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। একটি শক্তিশালী মত হলো, এটি 'সুফফা' (الصُّفَّة) থেকে উদ্ভূত, যারা দুনিয়ার বিলাসিতা পরিত্যাগ করে মসজিদে নববীর মঞ্চে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ভাষাবিদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "সুফফার সাথে সুফিদের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সুস্পষ্ট, কারণ তারাই প্রথম দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহর প্রেমে উৎসর্গিত হওয়ার যে নমুনা পেশ করেছিলেন, পরবর্তী সুফিরা তারই অনুসরণ করেছেন" (ইবনে তাইমিয়া, ১৯৮৭: ১১/৬)। অন্যদিকে, অনেকে 'সুফ' (পশম) থেকে 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি বলে থাকেন, কারণ প্রাথমিক যুগের জাহিদগণ পশমের তৈরি সাদাসিধা কাপড় পরিধান করতেন। যাই হোক না কেন, নাম যেখান থেকেই আসুক, তাসাউফের আত্মিক উত্তরাধিকার যে আসহাবে সুফফার জীবনাদর্শের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তা অনস্বীকার্য।

আল্লামা ইকবাল তাঁর 'ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন' গ্রন্থে বলেন, "সুফফা চত্বরের ত্যাগী মানুষগুলোই ছিলেন ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্থপতি। চতুর্দশ শতাব্দীর সেই সুফফাবাসীরা যেমন নবী-প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন, পরবর্তী যুগের ইমাম গাজালি, আব্দুল কাদির জিলানি, জালালুদ্দিন রুমি প্রমুখের আধ্যাত্মিকতায়ও আমরা সেই একই নবী-প্রেম, দারিদ্র্য-প্রীতি ও আত্মশুদ্ধির সুর শুনতে পাই" (ইকবাল, ২০১০: ১০২)।

সুফফার এই আধ্যাত্মিক ধারাটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেন আবু জর গিফারি (রা.), সালমান ফারসি (রা.), বিলাল (রা.) প্রমুখেরা। এদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সরাসরি অনুসারী ছিলেন হাসান বসরি (রহ.), উওয়াইস কারানি (রহ.), সা'দি শিরাজি (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত আত্মশুদ্ধিবাদী মনীষীগণ (আল-আত্তাস, ২০১১: ৬০)।

দুনিয়াবিমুখতা, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর প্রতি তৃপ্তির শিক্ষা

আসহাবে সুফফার আত্মিক জীবনের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ ছিল তিনটি: দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ), আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল), এবং তৃপ্তি (রিদা)। এই তিন স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তী তাসাউফের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে।

দুনিয়াবিমুখতার চরম দৃষ্টান্ত ছিলেন আবু জর গিফারি (রা.)। তিনি ছিলেন ধন-সম্পদের প্রতি প্রচন্ড বিমুখ এবং সবসময় কোরআন ও হাদিসের আলোকে ধনীদের সতর্ক করতেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "তোমাদের কেউ যখন সোনা-রূপার স্তুপ জমা করে, আর তার পাশে একজন অভাবী ক্ষুধায় কাতরায়, তখন সে আল্লাহর রাস্তায় লুটতরাজকারীর চেয়ে কম অপরাধী নয়", তা পরবর্তী সুফি কবিদের অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/১৬১)। একবার তিনি সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া (রা.)-কে সম্পদ জমা করার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছিলেন, যা তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার একটি কারণও হয়েছিল (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৪/১৭০)।

তাওয়াক্কুলের অনন্য উদাহরণ এই আসহাবে সুফফাই রেখেছেন। তারা দিনের পর দিন উপবাস থাকলেও কখনো কারো কাছে হাত পাতেননি। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতেন যে, আল্লাহই তাদের রিজিকদাতা। সূরা আত-ত্বালাকের সেই বিখ্যাত আয়াত "আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট" (সূরা আত-ত্বালাক: ৩) এই আয়াতের জীবন্ত ব্যাখ্যা ছিলেন তারা (কুরতুবী, ২০০৩: ১৮/২৭০)।

আল্লাহর প্রতি তৃপ্তির (রিদা) দৃষ্টান্ত এতটাই উঁচু ছিল যে, রাসূল (সা.)-এর ভাষায়, "তাদের এই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যই আখিরাতে তাদের সবচেয়ে বড় সম্মানের কারণ হবে।" (তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮)। তারা কখনো নিজেদের অবস্থার জন্য আল্লাহর কাছে

অভিযোগ করতেন না; বরং বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল" (প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শোকর)। এই তৃপ্তি পরবর্তী সুফি তরিকাসমূহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাকাম (স্তর) হিসেবে গণ্য হয়েছে (আল-কালাবাজি, ১৯৯৩: ৯৫)।

আধ্যাত্মিক সাধনায় তাদের কিংবদন্তি

বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) ছিলেন তাসাউফের ইতিহাসে প্রেম ও ধৈর্যের এক অনন্য প্রতীক। আবিসিনিয়ার কালো দাস থেকে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার পথে তাঁর যে আত্মিক সাধনা, তা সবার জন্য শিক্ষণীয়। মক্কার প্রখর রোদে বুকের ওপর পাথর রেখে যখন তাকে 'আহাদ, আহাদ' (এক আল্লাহ, এক আল্লাহ) বলতে শোনা যেত, তখন তা থেকেই সুফিরা শিখেছেন 'জিকির' বা আল্লাহর নাম স্মরণের শক্তি কী পরিমাণ আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/৩৪০)। তাঁর আধ্যাত্মিকতার গভীরতা এতটাই ছিল যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমি জান্নাতে আমার সামনে বিলালের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম" (বুখারি, হাদীস: ১১৪৯; মুসলিম, হাদীস: ২৪৫৮)।

সালমান ফারসি (রা.)-এর জীবন ছিল সত্যের সন্ধানে এক বিস্ময়কর অভিযাত্রা। অগ্নিপূজক পরিবার থেকে খ্রিস্টান সন্ন্যাসী, তারপর দাস হিসেবে মদিনায় এই পুরো পথ পরিক্রমায় তাঁর অন্তর্নিহিত আলোর সন্ধান তাসাউফের ইতিহাসে 'তালিব' (অন্বেষী)-এর এক অনন্য আদর্শ হয়ে আছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "সালমান আমাদের পরিবারের একজন" (আল-হাকিম, ১৯৯০: ৩/৬৫৪, সহীহ সনদে)। সুফি তরিকাসমূহের ধারাবাহিকতায় সালমান ফারসি (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়, এবং অনেক তরিকা তাদের আধ্যাত্মিক সিলসিলা (chain) তাঁর মাধ্যমে রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছানোর দাবি করে (গাজালি, ২০০১: ১/৮০)।

আবু দারদা (রা.) ছিলেন জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সমন্বয়। দামেস্কের মসজিদে তিনি যে জ্ঞানের হালাকা কায়েম করেছিলেন, তা ছিল একইসাথে ফিকহ, হাদিস ও তাসাউফের চর্চাকেন্দ্র। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "জ্ঞানের চেয়ে বড় কোনো ইবাদত নেই। ইবাদতের জন্য জ্ঞান অর্জন করো, আর জ্ঞানের সাথে সাথে আত্মাকে পবিত্র করো", তাসাউফ-ইলমের সম্পর্ককে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/২২১)। তিনি রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং বলতেন, "মানুষ ঘুমায় আর

আমি তখন তাদের জন্য ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করি” (ইবনে আসাকির, ১৯৯৫: ২৪/১৬৫)।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

বর্তমান যুগে আমরা যখন বস্তুবাদের সয়লাবে ডুবে আছি, যখন আত্মা তার খোরাক হারিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে, তখন আসহাবে সুফফার এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা বড্ড প্রাসঙ্গিক। আমাদের জীবনে ‘যুহদ’ অর্থ এই নয় যে, আমরা সবকিছু ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাব; বরং এর অর্থ হলো, দুনিয়ার জিনিস আমাদের হাতে থাকবে কিন্তু হৃদয়ে থাকবে না। ‘তাওয়াক্কুল’ অর্থ এই নয় যে, আমরা চেষ্টা ছেড়ে দেব; বরং সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেব। আর ‘রিদা’ মানে হলো, জীবনের প্রতিটি অবস্থায় উত্থানে-পতনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকা।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে কিছু সময় নিয়ে সেদিনের কাজের জন্য আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করতে পারি, এবং জীবনে যত কষ্টই আসুক না কেন, আবু জর (রা.)-এর মতো বিলাসিতা বর্জনের এবং বিলাল (রা.)-এর মতো ‘আহাদ আহাদ’ জিকিরের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি।

অধ্যায় ১৬: আসহাবে সুফফার জীবনাচার থেকে অনুপ্রেরণা

ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়গুলো থেকে যদি আমরা বর্তমানের জন্য আলো না নিই, তাহলে সেই ইতিহাস কেবল গল্পকথায় পরিণত হয়। আসহাবে সুফফার জীবনাচার ছিল এমন এক বহুমাত্রিক শিক্ষার সমাহার, যা আধুনিক জগতের জটিল সমস্যাগুলো যেমন ভোগবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও গৃহহীনতা মোকাবিলায় খুবই কার্যকরী এক মডেল উপস্থাপন করে। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁদের আদর্শের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করব।

অল্পে তুষ্টি ও ভোগ-বিলাস বর্জনের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো 'এফ্লুয়েঞ্জা' অর্থের অতি প্রাচুর্য থেকে সৃষ্ট এক মানসিক অসুখ, যেখানে মানুষ কখনোই সুখী হয় না, আরো চায়, আরো বড় গাড়ি চায়, আরো দামি পোশাক চায়। এই অস্থিরতার মূলে রয়েছে 'কানাআত' বা অল্পে তুষ্টির গুণ হারিয়ে ফেলা।

আসহাবে সুফফা ছিলেন 'কানাআত'-এর মূর্ত প্রতীক। তাদের কাছে খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল না, পরনের কাপড়টুকুও সম্পূর্ণ ছিল না, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল সবচেয়ে ধনী। আবু হুরায়রা (রা.)-এর ভাষায়, "ওই সত্তরজনকে আমি দেখেছি, যাদের একটিও পুরো চাদর ছিল না, অথচ তারা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ" (বুখারি, হাদীস: ৪৪২, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে)। এই তৃপ্তির রহস্য কী? তা হলো, তারা প্রয়োজনকে সীমিত করে ফেলেছিলেন, আর চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। আধুনিক অর্থনীতির ভাষায়, তারা 'নিড' ও 'ওয়ান্ট'-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন।

মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলো তার বিখ্যাত 'চাহিদার সোপানতত্ত্বে' বলেছেন, মানুষ যখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে, তখন সে উচ্চতর চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ভোগবাদী সমাজ মানুষকে মৌলিক চাহিদার স্তরেই আটকে রাখে, ক্রমাগত আরো নতুন 'কৃত্রিম চাহিদা' তৈরি করে (Maslow, ১৯৪৩: ৩৭০-৩৯৬)। সুফফাবাসীরা এই চক্র ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং উচ্চতর আত্মিক চাহিদা পূরণে ব্রতী হয়েছিলেন।

আমাদের উচিত, সুফফাবাসীদের মতো স্বেচ্ছায় সরল জীবনযাপন (voluntary simplicity) গ্রহণ করা। এর অর্থ দারিদ্র্যকে আলিঙ্গান করা নয়, বরং অপ্রয়োজনীয় ভোগ বাদ দেওয়া। যেমন, প্রতিবছর একটা সময় নির্দিষ্ট করে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ডিটক্স করতে পারি, কেনাকাটায় সংযত হতে পারি, এবং দামি রেস্টুরেন্টে না খেয়ে সেই টাকা কোনো অভাবীকে দান করতে পারি।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় তাদের মডেল

আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য একটা জ্বলন্ত সমস্যা। ধনী আরো ধনী হচ্ছে, আর গরিব আরো গরিব। এই বৈষম্য সমাজে অস্থিরতা, অপরাধ এবং হতাশা সৃষ্টি করছে। আসহাবে সুফফার মডেল এই বৈষম্য নিরসনে একটি নৈতিক দর্শন উপস্থাপন করে।

প্রথমত, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী “তোমাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে” (সূরা আয-যারিয়াত: ১৯)-এর বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ধনী সাহাবিদের সাথে আসহাবে সুফফার যে সম্পর্ক ছিল, তা ছিল অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের, করুণার সম্পর্ক নয়। আনসার সাহাবিরা তাদের নিজেদের সম্পদে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুফফাবাসীরা কখনো কারো কাছে অতিরিক্ত কিছু চাননি। তারা কাজ করার সুযোগ পেলেই কাজ করতেন, যেমন পানি সরবরাহ করে বা কাঠ কেটে বিক্রি করে (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ১/২৫৭)।

এই মডেল থেকে আমরা আজকের ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট’-এর একটি সংশোধিত রূপ পেতে পারি। যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ দরিদ্রদের জন্য নগদ অর্থের ব্যবস্থা করে দেবে, কিন্তু সেই সাথে তাদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ ও সুযোগ দেবে, যেমনিভাবে সুফফার শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ করে নিজেদের খরচ চালাতেন। একে আধুনিক পরিভাষায় ‘ওয়ার্কফেয়ার’ (workfare) মডেল বলা যেতে পারে, যেখানে ভাতা ও কর্ম একে অপরের সাথে যুক্ত (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ১২৫)।

সমাজের অসহায় ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনে তাদের ভূমিকা

আসহাবে সুফফা নিজেরা একসময় গৃহহীন ছিলেন এবং পরে যখন তাঁদের অবস্থার উন্নতি হয়, তখন তারা সমাজের অন্যান্য অসহায় ও গৃহহীন মানুষদের পাশে

দাঁড়িয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) খলিফা হওয়ার পরও কখনো নিজের অতীত ভোলেননি। তিনি মদিনার গভর্নর থাকাকালে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে অভাবীদের খুঁজে বের করে সাহায্য করতেন (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৬২৫)।

সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আসহাবে সুফফা 'গৃহহীনতা'কে কোনো কলঙ্ক হিসেবে দেখেননি। বরং, তারা সেটাকেই পরিণত করেছিলেন একটি মর্যাদায়, একটি ত্যাগের প্রতীকে। আজকের দিনে আমরা গৃহহীন মানুষদের যেভাবে 'ভবঘুরে', 'ভিখারি' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি, তা কত বড় মানবতাবিরোধী কাজ। অথচ আমাদেরই ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের একদল ছিলেন গৃহহীন।

আমাদের উচিত, সমাজের গৃহহীন ও অসহায় মানুষদের পুনর্বাসনে আসহাবে সুফফার এই মডেল অনুসরণ করা। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা ছোট ছোট এনজিওর মাধ্যমে কাজ করা। যাকাত ও সদকার অর্থ ব্যবহার করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা একটি আধুনিক 'সুফফা' তৈরি করতে পারি একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হবে।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমরা কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছি, আমাদের শহরের ফুটপাতে যারা ঘুমায়, তাদের জন্য আমার কী দায়িত্ব আছে? আমাদের বাড়িতে যদি একটি খালি ঘর থাকে, আমরা কি সেখানে কোনো দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে থাকতে দিতে পারি? আমাদের বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ কি আমরা নিয়মিতভাবে কোনো সুফফা-ধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দান করি?

আসুন, আমরা জীবনে 'অল্পে তুষ্টি'-র নীতি গ্রহণ করি। নিজেরা কম খরচ করি, কিন্তু অন্যের জন্য ব্যয় বাড়াই। প্রতি মাসে আমাদের আয়ের একটি অংশ বরাদ্দ রাখি সমাজের সেই 'আসহাবে সুফফা'দের জন্য, যারা অর্থের অভাবে নিজের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। চেষ্টা করি, আমরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ছোট ছোট 'সুফফা' তৈরি করতে পারি যেখানে জ্ঞান, ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগের সম্মিলন ঘটবে।

পঞ্চম পর্ব: স্মৃতি, ইতিহাস ও চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়গুলো কেবল স্মৃতির মনিকোঠায় স্থান পেলে সেগুলো নিছক গল্প হয়ে থাকে; কিন্তু যখন তা থেকে বর্তমানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এক চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতার আকর। আসহাবে সুফফার জীবনাদর্শ ও তাদের মর্যাদা ইতিহাসের একটি অমূল্য অধ্যায় হওয়া সত্ত্বেও, বর্তমান যুগে আমরা যেন তা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলেছি। এই পর্বে আমরা দেখবো কীভাবে ভৌত সুফফা চত্বরটি সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও তার আদর্শ অমর হয়ে আছে, কীভাবে কালজয়ী মুসলিম মনীষীরা তাদের স্মৃতি সংরক্ষণ করেছেন, এবং কীভাবে এই আদর্শ আজকের আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার জটিল সংকটসমূহের এক অনন্য সমাধান হতে পারে।

অধ্যায় ১৭: উত্তরাধিকার ও হারিয়ে যাওয়া সুফফা

ইতিহাসের অনেক মহৎ স্থাপনা প্রকৃতির নিয়মে বা মানবীয় প্রয়োজনে হারিয়ে যায়, কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া আদর্শ অমর থাকে। আসহাবে সুফফার সেই ঐতিহাসিক মঞ্চটি আজ আর মসজিদে নববীতে তার আদি রূপে নেই। উমাইয়া যুগের সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং সময়ের বিবর্তনে সুফফার ভৌত কাঠামো বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু হৃদয়হরণকারী এই অধ্যায়টি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি স্থানের চেয়ে তার চেতনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক আল-সামহুদি (রহ.) আক্ষেপ করে বলেছেন, "সুফফা চত্বরের নিদর্শন বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এর অদৃশ্য উত্তরাধিকার যুগে যুগে জ্ঞানীদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে" (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৫৫)।

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সম্প্রসারণে সুফফার বিলুপ্তি

উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামল (৮৬-৯৬ হিজরি / ৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য এক বিরাট স্থাপত্যিক উন্নয়নের যুগ। তাঁর নির্দেশে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা, দামেস্কের জামে মসজিদ এবং সর্বোপরি মদিনার মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই মহাপরিকল্পনার আওতায় মসজিদে নববীর চারপাশের জায়গা অধিগ্রহণ করে একে বর্তমান ভবনের প্রাথমিক কাঠামোতে রূপ দেওয়া হয় (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ৯/১৩৫)।

এই সম্প্রসারণের ফলে প্রাচীন সুফফা চত্বরটি, যা মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল, মূল মসজিদের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল-সামহুদি (রহ.) 'ওয়াফা আল-ওয়াফা' গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন যে, ওয়ালিদের এই বিশাল নির্মাণ প্রকল্পের ফলে সুফফার মূল অবস্থানটি তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং মসজিদের বর্ধিত অংশের সাথে মিশে যায় (আল-সামহুদি, ২০০৬: ১/৩৫০)। দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য নির্ধারিত এই পবিত্র স্থানটি তখন আর আগের মতো অবশিষ্ট রইল না। বলা যায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববীর যে আধুনিকীকরণ হয়েছিল, তারই একটি ঐতিহাসিক মূল্য ছিল সুফফা চত্বরের ভৌত বিলুপ্তি।

তবে ঐতিহাসিক ইবনে জাবালা (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের এই সম্প্রসারণ কেবল নিছক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছিল না, বরং এর পিছনে একটি প্রশাসনিক প্রয়োজন ছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী যখন দামেস্কে স্থানান্তরিত হলো, তখন মদিনার কেন্দ্রীয় মসজিদকে একটি প্রতীকী কেন্দ্র হিসেবে ধরে রাখতে এর আধুনিকীকরণ জরুরি হয়ে পড়েছিল (ইবনে জাবালা, ১৯৮৮: ৮৫)। কিন্তু এই আধুনিকীকরণের বলি হলো সেই ঐতিহাসিক সুফফা, যেখানে ইসলামের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

বর্তমান মসজিদে নববীতে 'দিক্কাত আল-আগাওয়াত'-এর ইতিহাস ও অবস্থান

বর্তমান মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্বাংশে রাসূল (সা.)-এর হুজরার সামান্য পূর্ব-উত্তর দিকে একটি উঁচু মঞ্চ দেখা যায়, যা 'দিক্কাত আল-আগাওয়াত' (دكة الأغوات) নামে পরিচিত। 'আগাওয়াত' শব্দটি 'আগা'-এর বহুবচন, যা দ্বারা উসমানীয় যুগে মসজিদে নববীর খাদেমদের বোঝানো হতো। এই মঞ্চটি ঐতিহাসিক সুফফার স্থানে বা তার সন্নিকটে অবস্থিত বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা (আল-কাদি, ২০০৭: ১৬২)।

মদীনা গবেষক ড. ইয়াদ আল-কাদি বলেন, "দিক্কাত আল-আগাওয়াতই হলো সে স্থান, যেখানে একসময় সুফফা ছিল। যদিও বর্তমান মঞ্চটি পরবর্তী যুগের নির্মাণ, তবুও এর অবস্থান হাদিস ও ইতিহাসে বর্ণিত সুফফার অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ" (আল-কাদি, ২০০৭: ১৬৩)। উসমানীয় সুলতানগণ মসজিদে নববীর দেখভালের জন্য যে খাদেম নিযুক্ত করেছিলেন, তারা এই মঞ্চে বসে পাহারা দিতেন। পরবর্তীতে এটি একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো, যেখানে মসজিদের ইমাম ও খাদেমরা কোরআন ও হাদিসের সবক দিতেন। এভাবেই যুগে যুগে সুফফার স্মৃতিটুকু একটি ভিন্ন রূপে টিকে ছিল।

তবে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বর্তমান যুগের সাধারণ মুসল্লি ও দর্শনার্থীরা এই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে খুব কমই জানেন। মসজিদে নববীর জিয়ারতকারীরা 'রিয়াদুল জান্নাহ' ও রাসূল (সা.)-এর রওজা শরিফ দেখতে ভিড় করলেও, সুফফার স্মৃতিচিহ্ন 'দিক্কাত আল-আগাওয়াত'-এর কাছে খুব কম মানুষই ইতিহাসের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন।

ঐতিহাসিকভাবে সুফফা চত্বরের গুরুত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস সংরক্ষণ করা একটি সভ্য সমাজের দায়িত্ব। ইউনেস্কো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণে যে তাগিদ দেয়, সেভাবে মুসলিম বিশ্বেরও উচিত ইসলামের প্রথম যুগের স্মৃতিচিহ্নগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা। সুফফা চত্বর শুধু একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়; এটি হলো মুসলিম সভ্যতার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র, প্রথম 'ছাত্রাবাস', প্রথম বৃত্তি ব্যবস্থা, এবং আত্মশুদ্ধির প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পাঠশালা।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সৌদি আরবের প্রশাসন মসজিদের আশপাশে ব্যাপক বাণিজ্যিক উন্নয়নের ফলে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন বিলুপ্ত করেছে। যদিও 'দিক্কাত আল-আগাওয়াত' এখনো টিকে আছে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে, তবুও সুফফার ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও জনসচেতনতা প্রয়োজন (Omer, ২০০৯: ১৬৮)।

এক্ষেত্রে করণীয় হলো, মসজিদে নববীর কর্তৃপক্ষের উচিত সুফফার আনুমানিক স্থানে একটি তথ্যকেন্দ্র বা ছোট জাদুঘর স্থাপন করা, যেখানে দর্শনার্থীরা সুফফার ইতিহাস, সেখানে অবস্থানকারী সাহাবিদের জীবনী ও অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তি যেমন অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) ব্যবহার করে দর্শনার্থীদের সামনে সুফফার একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ তুলে ধরা যেতে পারে, যাতে তারা রাসূল (সা.)-এর যুগের পরিবেশ অনুভব করতে পারেন।

সমসাময়িক উদাহরণ ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাস কতটা সংরক্ষণ করি? আমাদের দাদা-নানার জীবনকথা, তাদের ত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনিগুলো কি আমরা আমাদের সন্তানদের শোনাই? অথচ এগুলো পারিবারিক 'সুফফা'র ইতিহাস। আসুন, আমরা আমাদের পরিবারের জ্ঞানী ও ত্যাগী পূর্বপুরুষদের জীবনী লিখে রাখি, তাদের রেখে যাওয়া শিক্ষাগুলো সংরক্ষণ করি। একইভাবে, সমাজের যে সমস্ত জ্ঞানী ও সেবাব্রতী মানুষ নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের নিয়ে লেখা, তথ্যচিত্র তৈরি করা ও তাদেরকে সম্মানিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অধ্যায় ১৮: কলমের কালিতে আসহাবে সুফফা

সুফফার ভৌত কাঠামো বিলীন হয়ে গেলেও, তাদের জীবন ও কর্ম ইতিহাসের পাতায় এবং মুহাদ্দিসদের গ্রন্থে চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে আছে। কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সেইসব গবেষক ও ইতিহাসবিদদের, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ত্যাগী মানুষগুলোর স্মৃতি আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে মুসলিম স্কলারশিপ আসহাবে সুফফার জীবন ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে এবং আধুনিক যুগে একাডেমিক গবেষণায় তারা কীভাবে মূল্যায়িত হচ্ছেন।

ইমাম সুয়ুতি, হাফেজ আবু নুআইম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের কাজে আসহাবে সুফফা

ইসলামী ইতিহাস রচনার বিস্ময়কর দিক হলো, প্রাথমিক যুগের ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিটি ব্যক্তি ও ঘটনার বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন। আসহাবে সুফফা সম্পর্কেও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) (মৃত্যু ৯১১ হি./১৫০৫ খ্রি.) ছিলেন মিশরের একজন প্রখ্যাত বিশ্বকোষীয় আলেম। তিনি ‘আদ-দুর আল-মানসুর ফি তাফসির বিল-মাসুর’ ও অন্যান্য গ্রন্থে আসহাবে সুফফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আসহাবে সুফফার সংখ্যা ছিল ৪০০ পর্যন্ত, যারা ছিলেন ইসলামী ইলমের প্রথম আবাসিক ছাত্র (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৫)। তিনি তাদের জীবন ও মর্যাদা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিও রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী গবেষকদের জন্য অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

হাফেজ আবু নুআইম আল-ইসফাহানি (রহ.) (মৃত্যু ৪৩০ হি./১০৩৮ খ্রি.) ছিলেন পারস্যের ইসফাহানের এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া’ (সাধুদের অলংকার ও পবিত্র ব্যক্তিদের শ্রেণিবিভাগ) -এ তিনি আসহাবে সুফফার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় সংকলন করেছেন। তিনি তাদের জীবনী, ফজিলত ও কর্ম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা ৭০ বলে উল্লেখ করেছেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৩৮-৩৬০)। এই গ্রন্থটি ছাড়া আসহাবে সুফফার ইতিহাস জানা প্রায় অসম্ভব ছিল।

এছাড়াও, ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.)-এর ‘আত-তাবাকাত আল-কুবরা’ (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮), ইমাম বুখারি (রহ.)-এর ‘আত-তারীখ আল-কাবির’, এবং ইমাম তাবারি (রহ.)-এর ‘তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলুক’-এ বিভিন্ন সূত্রে আসহাবে সুফফার উল্লেখ আছে। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তাঁর ‘আল-ইসাবা ফি তাময়িজ আল-সাহাবা’ গ্রন্থে আসহাবে সুফফার প্রত্যেক সদস্যের জীবনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও অবদান আলোচনা করেছেন (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৭/৩১৬-৩৩০)।

‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাদের জীবনী

হাফেজ আবু নুআইম-এর ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ গ্রন্থটি শুধু একটি হাদিস বা ইতিহাসের বই নয়, বরং এটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক জীবনী সংকলন। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডেই লেখক আসহাবে সুফফার জীবনী ও মর্যাদা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে লিখেছেন, “তারা ছিলেন সেই ভাগ্যবান দল, যারা দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গিত হয়েছিলেন। দারিদ্র্য তাদের জন্য ছিল পরম অহংকার” (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৩৮)।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আসহাবে সুফফা সংখ্যায় ৭০ থেকে ৪০০-এর মধ্যে ছিলেন এবং তাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ আবিসিনিয়া, পারস্য, রোম ও আরবের বিভিন্ন গোত্র। এই বৈচিত্র্যে তারা ছিলেন ইসলামের সর্বজনীনতার এক জীবন্ত উদাহরণ। আবু নুআইম (রহ.) প্রতিটি সদস্যের নাম, উপনাম, ইসলাম গ্রহণের কাহিনি ও সুফফায় তাদের অবদান সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা পরবর্তী যে কোনো গবেষণার ভিত্তি হয়ে আছে (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৪৫)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ‘মাজমু আল-ফাতাওয়া’তেও আসহাবে সুফফার প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি তাদেরকে ‘জ্ঞানী ফকির’ (আল-ফুকারা আল-উলামা) হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানিয়েছেন (ইবনে তাইমিয়া, ১৯৮৭: ১১/৮)।

আধুনিক একাডেমিক গবেষণায় আসহাবে সুফফার মূল্যায়ন

আধুনিক যুগে আসহাবে সুফফা নিয়ে একাডেমিক গবেষণা খুব বেশি না হলেও, গত কয়েক দশকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ (মৃত্যু ২০০২) তাঁর 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রচিন্তা' এবং 'ইসলামের অর্থনীতি ও বাণিজ্য' গ্রন্থে আসহাবে সুফফাকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষিত ক্যাডার ও প্রথম 'স্কলারশিপ প্রোগ্রাম'-এর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন (হামিদুল্লাহ, ১৯৮৭: ১১০-১৩০)।

পশ্চিমা পণ্ডিতদের মধ্যে ডব্লিউ. মন্টগোমারি ওয়াট তাঁর 'Muhammad at Medina' গ্রন্থে আসহাবে সুফফাকে 'ইসলামের প্রথম সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও এ শব্দটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। তিনি লিখেছেন, "সুফফার দরিদ্র সম্প্রদায়টি ছিল মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের একটি বিশেষ কল্যাণ প্রকল্প, যেখানে শিক্ষার্থীরা পূর্ণকালীন জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেত" (Watt, ১৯৫৬: ৭৮)।

আরেকজন আধুনিক গবেষক ড. স্পাহিচ ওমর, স্থাপত্য ও শিক্ষার ইতিহাসবিদ, তাঁর 'The History and Character of the Islamic Built Environment' গ্রন্থে সুফফার স্থাপত্যিক ও শিক্ষাগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বলেন, "সুফফা ছিল বিশ্বের প্রথম 'মাদরাসা' যেখানে আবাসন, খাদ্য ও শিক্ষা একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আওতায় বিনামূল্যে প্রদান করা হতো" (Omer, ২০০৯: ১৪৫)।

তবে আক্ষেপের বিষয় হলো, এই বিপুল গুরুত্ব সত্ত্বেও আসহাবে সুফফা নিয়ে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ গবেষণা খুবই কম। কিছু ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও আর্টিকেল প্রকাশিত হলেও, তাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এখনো হয়নি। যে বইটি আপনার হাতে রয়েছে, তা বাংলা ভাষায় এই শূন্যস্থান পূরণে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

সমসাময়িক উদাহরণ ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমাদের সমাজে এখনো এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা গভীর জ্ঞান ও ত্যাগের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রচারের আড়ালে থেকে যান। আমাদের উচিত, আমরা যেন আমাদের স্থানীয় আলেম, শিক্ষক, ও সমাজসেবকদের জীবনী লেখার চর্চা শুরু করি।

একটি ডায়রি বা ব্লগ খুলে আমরা নিয়মিত আমাদের সময়ের ‘আসহাবে সুফফা’ অর্থাৎ যারা ইলম ও খেদমতে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পারি। এছাড়া, আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’-র অনুকরণে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১৯: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আসহাবে সুফফার শিক্ষা

বর্তমান বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা গভীর সংকটে নিমজ্জিত। শিক্ষা হয়ে পড়েছে পণ্য, ডিগ্রি হয়েছে কেবল চাকরির চাবিকাঠি, আর শিক্ষার্থীদের আত্মিক ও নৈতিক বিকাশ যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে। এই অন্ধকারে আসহাবে সুফফার আদর্শ যেন এক বাতিঘর। তাদের সেই প্রাচীন শিক্ষা মডেল বর্তমান সময়ের সংকট নিরসনে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

বোর্ডিং বা আবাসিক শিক্ষা মডেলের প্রাচীন নমুনা

পৃথিবীর ইতিহাসে বোর্ডিং স্কুল বা আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণা খুব একটা প্রাচীন নয়। ইউরোপে পাবলিক স্কুলগুলোর বোর্ডিং সুবিধা চালু হয় মধ্যযুগে, আর উপমহাদেশে ইংরেজ আমলে। কিন্তু আসহাবে সুফফার আবাসন ব্যবস্থা ছিল এর প্রায় এক হাজার বছর আগের এক অনন্য নমুনা।

সুফফায় শিক্ষার্থীরা সার্বক্ষণিক শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকতেন। তারা একসাথে থাকতেন, একসাথে পড়তেন, একসাথে খেতেন এবং একসাথে নামাজ পড়তেন। এই জীবনপদ্ধতির ফলে তাদের মধ্যে এক গভীর ভ্রাতৃত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছিল। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে, একটি ভালো বোর্ডিং পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীলতা, সহমর্মিতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়তা করে (White, ২০০৪: ৫৫)।

তবে সুফফার মডেলের সাথে আধুনিক বোর্ডিং স্কুলের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। আধুনিক বোর্ডিং স্কুলগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল, যা কেবল ধনীদের জন্যই সংরক্ষিত। অথচ সুফফা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, বরং দরিদ্র ও গৃহহীনদের জন্যই ছিল এর দ্বার উন্মুক্ত। তারা রাষ্ট্র ও সমাজের সহায়তায় চলতেন। এটি ছিল সত্যিকারের ‘ইকুয়াল এক্সেস টু এডুকেশন’-এর মডেল।

জ্ঞান, দক্ষতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত শিক্ষা কারিকুলাম

আধুনিক শিক্ষার আরেকটি বড় ত্রুটি হলো, এটি জ্ঞান, দক্ষতা ও আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। বিজ্ঞান শেখানো হয় নাস্তিক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, কলা শেখানো হয় নৈতিকতা বিবর্জিতভাবে, আর ধর্ম শেখানো হয় সম্পূর্ণ রক্ষণশীল গোঁড়ামির সাথে। এই বিভাজনই ব্যক্তি ও সমাজে স্কিৎজোফ্রেনিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে।

সুফফার শিক্ষা কারিকুলাম ছিল সম্পূর্ণ সমন্বিত। সেখানে কোরআন ও হাদিস ছিল সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি, কিন্তু একই সাথে শিক্ষার্থীরা ফিকহ (আইন), কেরাত (তিলাওয়াতবিদ্যা), প্রশাসন, অর্থনীতি ও সামরিক কৌশল শিখতেন। তারা আত্মশুদ্ধি, ইবাদত ও জিকিরের মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতেন, আর অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতেন সমাজের সেবায়। ইমাম গাজালি (রহ.)-এর ভাষায়, "শরীয়ত ও তরিকত ছিল যমজ ভাই; একটির উদ্দেশ্য বাহ্যিক কল্যাণ, অপরটির উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি; সুফফার শিক্ষার্থীরা এই দুয়েরই সমন্বয় ঘটাতেন" (আল-গাজালি, ২০০১: ১/১১২)।

এ থেকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে: শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন কেবল চাকরি না হয়, বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ (ইনসানে কামিল) গড়ে তোলাই যেন হয় শিক্ষার লক্ষ্য। জন্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম, যুক্তি ও বিশ্বাস, বাহ্যিক জ্ঞান ও আত্মিক প্রশিক্ষণ এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক এই বোধ জাগ্রত করা জরুরি।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধে সুফফা মডেলের প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। শিক্ষা আজ বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা 'গ্রাহক' আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 'ব্যবসা প্রতিষ্ঠান'। এর ফলে ঋণের বোঝায় জর্জরিত এক প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ঋণ পরিশোধ করা। আমেরিকায় স্টুডেন্ট লোন ঋণের পরিমাণ ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে (Federal Reserve, ২০২১)।

এই ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থার বিপরীতে সুফফা মডেল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে শিক্ষা ছিল ইবাদত। শিক্ষার্থীরা ফি দিতেন না, শিক্ষকরাও কোনো বেতন নিতেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা জ্ঞান বিতরণ করো, কিন্তু এর জন্য কোনো মূল্য গ্রহণ করো না"

(তিরমিযি, হাদীস: ২৬৩৮, হাসান সহীহ)। আসহাবে সুফফার জন্য রাষ্ট্র ও ধনী নাগরিকরা যাকাত, সদকা ও হাদিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সংস্থান করতেন, যা ছিল একটি সমাজভিত্তিক ফান্ডিং মডেল। এই মডেলে শিক্ষার্থীর ওপর কোনো আর্থিক চাপ ছিল না।

আধুনিক যুগে আমরা যদি শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ করতে চাই, তাহলে আমাদের ওয়াকফ বা ট্রাস্ট ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে। ইসলামী ইতিহাসে মাদরাসাগুলো ওয়াকফকৃত জমি ও সম্পদের আয়েই চলত, যার ফলে সেগুলো সরকারি বা বাণিজ্যিক চাপ থেকে মুক্ত ছিল। সুফফা ছিল এই ব্যবস্থার অগ্রদূত। বর্তমানে মালয়েশিয়া, তুরস্ক ও কিছু আরব দেশে 'ওয়াকফ ইউনিভার্সিটি'-এর ধারণা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, যা সুফফা চত্বরেরই আধুনিক প্রতিচ্ছবি।

সমসাময়িক উদাহরণ ও ব্যক্তিগত অনুশীলন

আমাদের কি কিছু করার আছে? আমরা কি আমাদের সাধ্যমতো একটি 'আধুনিক সুফফা' তৈরি করতে পারি? হয়তো পারি না একটি বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু একটি আবাসিক টিউটোরিয়াল গ্রুপ, একটি কোচিং সেন্টার, যেখানে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পড়ানোর পাশাপাশি তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তা তো করাই যায়। আমরা চাইলে প্রতিজ্ঞা করতে পারি, আমাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমরা শিক্ষার ওয়াকফে দান করবো। আসুন, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ককে আবার 'ব্যবসায়িক লেনদেন' থেকে 'আধ্যাত্মিক বন্ধনে' রূপান্তরিত করি।

অধ্যায় ২০: নির্বাচিত আসহাবে সুফফার জীবনী সংকলন

এই অধ্যায়টি একটি রেফারেন্স চ্যাপ্টার হিসেবে কাজ করবে, যেখানে আসহাবে সুফফার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের জীবনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। পাঠক এখান থেকে তাদের জীবন ও অবদান সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন, যা আরো গভীর অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করবে।

১. হজরত আবু হুরায়রা আদ-দাওসি (রা.)

- (মৃত্যু: ৫৭ বা ৫৮ হিজরি / ৬৭৮ খ্রি.)
- **পরিচয়:** আসল নাম আব্দুর রহমান ইবনে সাখর। ইয়েমেনের দাওস গোত্রের সন্তান। ৭ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন এবং সম্পূর্ণ সময় সুফফায় অবস্থান করে ইলম অর্জনে নিমগ্ন থাকেন (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৫৭৮)।
- **অবদান:** ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী (৫৩৭৪টি)। তিনি নিজের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিনিময়ে রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অলৌকিক। খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে বাহরাইনের গভর্নর এবং পরে মদিনার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'দার আল-হাদিস' প্রতিষ্ঠা করে হাদিস শিক্ষার প্রসার ঘটান (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৭/৩১৮)।

২. হজরত আবু উবাইদাহ আমির ইবনে জাররাহ (রা.)

- (মৃত্যু: ১৮ হিজরি / ৬৩৯ খ্রি. প্লেগে)
- **পরিচয়:** কুরাইশ বংশের ফিহর গোত্রের সন্তান। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিম এবং 'আশারা মুবাশশারা'-র একজন। তিনি সুফফার মজলিসে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং ইলম অর্জন করতেন (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ৪/১৬৯৮)।

- **অবদান:** বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। রাসূল (সা.) তাঁকে 'আমিন আল-উম্মাহ' (উম্মতের বিশ্বস্ত মানুষ) উপাধি দেন। খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে তিনি সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। সেখানকার খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাথেও ন্যায়বিচার ও চমৎকার ব্যবহারের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন (হামিদুল্লাহ, ২০০৩: ১৫২)।

৩. হজরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.)

- (মৃত্যু: ২০ হিজরি / ৬৪১ খ্রি.)

- **পরিচয়:** আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) ক্রীতদাস বংশোদ্ভূত। প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করে চরম নির্যাতন ভোগ করেন। আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। তিনি সুফফার অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ১/৩৪০)।

- **অবদান:** ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। তাঁর ধৈর্য ও আত্মত্যাগ তাসাউফের ইতিহাসে কিংবদন্তিতুল্য। 'আহাদ, আহাদ' জিকির ও ভালোবাসার জন্য বিখ্যাত। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি মদিনা ছেড়ে সিরিয়ার জিহাদে অংশ নেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/১৪৮)।

৪. হজরত সালমান আল-ফারসি (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৬ হিজরি / ৬৫৬ খ্রি.)

- **পরিচয়:** পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত অগ্নিপূজক পরিবারের সন্তান। সত্যের সন্ধানে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন এবং শেষে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকাহিনীকে এক 'আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা' বলা হয় (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৪/৫৩)।

- **অবদান:** খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের কৌশল প্রদান করে তিনি মুসলিমদের রক্ষা করেন। রাসূল (সা.) তাঁকে 'আহলে বাইতের সদস্য' (আমার পরিবারের সদস্য) বলে সম্বোধন করেন। তিনি পারস্যের মাদায়েন

শহরে ইসলামী জ্ঞানের প্রসার ঘটান এবং তাসাউফের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত (আল-হাকিম, ১৯৯০: ৩/৬৫৪)।

৫. হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)

- (মৃত্যু: ১৮ হিজরি / ৬৩৯ খ্রি. প্লেগে)
- **পরিচয়:** মদিনার আনসার গোত্রের খাজরাজ বংশের তরুণ সাহাবি। ইসলাম গ্রহণের পর পুরোপুরি ইলম অর্জনে মনোযোগী হন এবং রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন (আল-জুহাইলি, ২০০২: ২/১৮১০)।
- **অবদান:** রাসূল (সা.) তাকে 'আমার উম্মতের মধ্যে হালাল-হারামের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী' বলে আখ্যা দেন। তিনি ইয়েমেনের গভর্নর, বিচারক ও শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন এবং সেখানকার ইসলামী জ্ঞানচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন (আবু দাউদ, ৩৫৯২)। আমওয়াসের প্লেগে তিনি শহীদ হন।

৬. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)

- (মৃত্যু: ৩২ হিজরি / ৬৫৩ খ্রি.)
- **পরিচয়:** কুরাইশদের মিত্র বনু যুহরা গোত্রের সন্তান। প্রাথমিক যুগের মুসলিম। দুর্বল ও সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত হলেও ইলমে তিনি ছিলেন অসাধারণ (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ৩/৯৮৭)।
- **অবদান:** রাসূল (সা.)-এর খাদেম হিসেবে পরিচিত। কোরআন ও তাফসিরে অসামান্য জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত। রাসূল (সা.) বলেন, "যে কোরআন তিলাওয়াত করতে চায় সেভাবে যেভাবে নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আবদের (ইবনে মাসউদ) কেরাত শেখে" (ইবনে মাজাহ, ১৩৮)। তিনি কুফা শহরে গিয়ে সেখানকার বিচারক ও শিক্ষক হিসেবে কুফার মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৩৫৫)।

৭. হজরত আবু জর আল-গিফারি (রা.)

- (মৃত্যু: ৩২ হিজরি / ৬৫২ খ্রি.)

- **পরিচয়:** মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি গিফার গোত্রের সন্তান। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিম। খোলাখুলিভাবে ইসলাম ঘোষণা করে কুরাইশদের কাছে প্রহারিত হন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/১৫৬)।

- **অবদান:** দুনিয়াবিমুখতা ও তাওয়াক্কুলে অনন্য দৃষ্টান্ত। ধনীদের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর সোচ্চার ছিলেন। রাসূল (সা.) তার সততার প্রশংসা করে বলেন, "আকাশের নিচে ও জমিনের ওপরে আবু জরের চেয়ে বেশি সত্যবাদী কেউ নেই" (তিরমিযি, ৩৮০১)। তাসাউফের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল ধারা সৃষ্টি করেন।

৮. হজরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৬ হিজরি / ৬৫৬ খ্রি.)

- **পরিচয়:** মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি গোত্রের সন্তান। পিতা ও চাচা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সাহাবি ছিলেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৬/১৫)।

- **অবদান:** রাসূল (সা.)-এর গোপন সংবাদের রক্ষক (মুনাফিকদের নাম জানতেন)। পারস্য বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মাদায়েন শহরের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে কোরআন ও ইসলামী জ্ঞানের প্রসার ঘটান। তাঁর দূরদর্শিতা ও গুপ্তচরবৃত্তির কৌশল ছিল কিংবদন্তিতুল্য (মুসলিম, ২৭৭০)।

৯. হজরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৩ হিজরি / ৬৫৩ খ্রি.)

- **পরিচয়:** ইয়েমেনের বাহরা অঞ্চলের কিন্দা গোত্রের সন্তান। মক্কায় পালিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে মদিনায় আসেন। সুফফার স্থায়ী সদস্যদের একজন ছিলেন (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ৪/১৪৮০)।

- **অবদান:** বদর যুদ্ধের আগে তাঁর চূড়ান্ত সাহসিকতার ঘোষণা ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, "আমরা বনি ইসরাইলের মতো বলব না যে 'তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর', বরং আমরা আপনার ডানে-বামে থেকে যুদ্ধ করব" (বুখারি, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে)। সকল যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

১০. হজরত আবু দারদা (রা.)

- (মৃত্যু: ৩২ হিজরি / ৬৫২ খ্রি.)
- **পরিচয়:** মদিনার আনসার গোত্রের খাজরাজ বংশের সন্তান। মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইবাদত ও জ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগী (জাহাবি, ১৯৯৮: ২/৩৩৫)।
- **অবদান:** কোরআনের হাফিজ ও বিচারক। খলিফা উসমান (রা.)-এর সময়ে দামেস্কের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। দামেস্ক জামে মসজিদে তিনি এক বিশাল হালাকা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে শত শত তাবেয়ি কোরআন ও হাদিস শিখতেন। তাঁর রাত্রি জাগরণ ও ইবাদত কিংবদন্তিতুল্য (ইবনে আসাকির, ১৯৯৫: ২৪/১৬০)।

১১. হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)

- (মৃত্যু: ৫৫ হিজরি / ৬৭৫ খ্রি.)
- **পরিচয়:** কুরাইশ বংশের যুহরা গোত্রের সন্তান ও রাসূল (সা.)-এর নিকটাত্মীয়। সতেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম যুবকদের একজন। তিনি সুফফার নিয়মিত ছাত্র ছিলেন (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৮)।
- **অবদান:** আশারা মুবাশশারার একজন। কাদেরিয়া যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। রাসূল (সা.) ওহুদের যুদ্ধে তাঁর সম্পর্কে বলেন, "হে সাদ! তীর ছোড়ো, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য

কোরবান হোক” (বুখারি, ৪০৫৮)। তিনি কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইরাকের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

১২. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)

- (মৃত্যু: ১৫ হিজরি / ৬৩৬ খ্রি. কাদেরিয়া যুদ্ধে)
- **পরিচয়:** রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর নিকটাত্মীয় এবং জন্মান্ধ সাহাবি (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ৩/৯৯৪)।
- **অবদান:** মদিনায় রাসূল (সা.)-এর অনুপস্থিতিতে একাধিকবার ইমামতি করেন। বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। পবিত্র কোরআনের সূরা আবাসার শানে নুযুলের সাথে জড়িত। কাদেরিয়া যুদ্ধে ইসলামী পতাকা বহন করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

১৩. হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৭ হিজরি / ৬৫৭ খ্রি. সিফফিন যুদ্ধে)
- **পরিচয়:** মক্কার ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত গোলাম পরিবারের সন্তান। পিতা ইয়াসির (রা.), মা সুমাইয়া (রা.), পুরো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে চরম নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর মা ইসলামের প্রথম শহীদ (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/১৭৬)।
- **অবদান:** প্রাথমিক যুগের সাহাবি ও সুফফার সক্রিয় সদস্য। রাসূল (সা.) তার সম্পর্কে বলেন, “আম্মারকে একদল বিদ্রোহী হত্যা করবে” (বুখারি, ২৮১২)। তিনি বদর, ওহুদসহ সকল যুদ্ধে অংশ নেন। হজরত উমর (রা.)-এর খিলাফতে কুফার গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৪. হজরত সুহাইব আর-রুমি (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৮ হিজরি / ৬৫৯ খ্রি.)

- **পরিচয়:** রোমান (বাইজেন্টাইন) বংশোদ্ভূত। বাল্যকালে বন্দি হয়ে আরবে আসেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ'আন তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে চরম নির্যাতন সহ্য করেন (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৩/২৩৩)।

- **অবদান:** হিজরতের সময় তাঁর সকল সম্পদ কুরাইশদের দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে যান, তখন রাসূল (সা.) বলেন, "তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে" (আল-হাকিম, ৩/৪৫৪)। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, দানশীল ও বিনয়ী। খলিফা উমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর সাময়িকভাবে ইমামতি করেন।

১৫. হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.)

- (মৃত্যু: ১২ হিজরি / ৬৩৩ খ্রি. ইয়ামামার যুদ্ধে)

- **পরিচয়:** কুরাইশ বংশীয় হজরত উমর (রা.)-এর ছোট ভাই। উমর (রা.)-এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে মদিনায় আসেন। সুফফার স্থায়ী সদস্যদের একজন ছিলেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/২৮০)।

- **অবদান:** বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধের বীরযোদ্ধা। ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ড নবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতে উমর (রা.) অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছিলেন এবং বলতেন, "জায়েদের মৃত্যুতে আমার চেয়ে বেশি শোক আর কেউ পায়নি" (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ২/৫৫০)।

১৬. হজরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৭ হিজরি / ৬৫৭ খ্রি.)

- **পরিচয়:** বনু তামিম গোত্রের সন্তান। বাল্যকালে বন্দি হয়ে মক্কায় দাস হিসেবে বিক্রি হন। প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর মনিব উম্মে আম্মার তাকে চরম নির্যাতন করে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিত (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/১১৬)।

- **সুফফায় অবদান:** তিনি সুফফার স্থায়ী সদস্যদের একজন ছিলেন। কোরআনের প্রথম শিক্ষকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি কুফায় চলে যান এবং সেখানে কোরআন ও হাদিস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ ও ধৈর্য প্রবাদতুল্য (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ২/৪৫৫)।

১৭. হজরত আবু মারসাদ কান্নাজ ইবনে হুসায়ন আল-আদাবি (রা.)

- (মৃত্যু: ১২ হিজরি / ৬৩৩ খ্রি.?)
- **পরিচয়:** 'আদাবি' গোত্রের সন্তান। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র মারসাদ উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশ নেন (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৭/৩৪৫)।
- **সুফফায় অবদান:** তিনি সুফফার দরিদ্র ও আত্মনিবেদিত সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে ইবাদত ও রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে উৎসর্গিত। তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন এবং ইন্তেকাল করেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৫২)।

১৮. হজরত আবু কাবশাহ (রা.)

- (পরিচিতি: রাসূল সা.-এর আযাদকৃত গোলাম)
- **পরিচয়:** তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর আযাদকৃত দাস। কুরআন ও হাদিসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন এবং সুফফার একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৫৬)।
- **অবদান:** জীবনের পুরোটা সময় তিনি ইবাদত ও জ্ঞানচর্চায় কাটিয়ে দেন। রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি ইলম অর্জনের সুযোগ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ছিল। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও বিনয়ের কারণে সাহাবিদের মধ্যে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/৪৬)।

১৯. হজরত মিসতাহ ইবনে উসাসা (রা.)

- (মৃত্যু: ৩৪ হিজরি / ৬৫৪ খ্রি.)
- **পরিচয়:** কুরাইশ বংশের মুত্তালিব গোত্রের সন্তান। আবু বকর (রা.)-এর নিকটাত্মীয়। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৬/১০০)।
- **সুফফায় অবদান:** ইফকের ঘটনায় তিনি কিছু ভুল তথ্য পরিবেশনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যার জন্য আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহ কোরআনে তাঁর ক্ষমার ঘোষণা দেন (সূরা আন-নূর: ২২)। তিনি সুফফার পরিবেশে থেকে ইলম ও তাওবা করে নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন। তাঁর জীবন teaches us that sincere repentance can restore one's honor.

২০. হজরত উয়ায়ম ইবনে সায়েদাহ (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)
- **পরিচয়:** মদিনার আনসার গোত্রের আউস বংশের সন্তান। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের সবকিছু রাসূল (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করেন এবং সুফফায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ৪/১৮৮০)।
- **সুফফায় অবদান:** তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ ইবাদত ও জ্ঞানচর্চার জন্য নিবেদিত। তিনি কোরআনের হাফিজ ছিলেন এবং রাসূল (সা.)-এর মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত থেকে হাদিস মুখস্থ করতেন। বিনয় ও নম্রতার জন্য তিনি সাহাবিদের মাঝে পরিচিত ছিলেন।

২১. হজরত সালিম ইবনে উমায়র (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)

- **পরিচয়:** তিনি সুফফার একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ইবনে হাজার (রহ.)-এর মতে, তিনি ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং সে যুদ্ধে তিনি গভীর ক্ষত-বিক্ষত হন (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৩/১০)।

- **সুফফায় অবদান:** দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও জ্ঞানার্জন ও ইবাদতে তিনি ছিলেন নিরলস। রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে থেকে তিনি বহু হাদিস অর্জন করেন এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর 'মুসনাদ'-এ তাঁর বর্ণিত হাদিস সংকলিত আছে।

২২. হজরত আবুল বাশআর কাব ইবনে আমর (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)

- **পরিচয়:** তাঁর উপনাম 'আবুল বাশআর'। তিনি মদিনার আনসার গোত্রের সদস্য এবং সুফফার একজন জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল ছাত্র ছিলেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৫৮)।

- **সুফফায় অবদান:** তিনি হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারির জন্য রাসূল (সা.)-এর কাছে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। তিনি পরবর্তী জীবনে জিহাদে অংশ নেন এবং ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

২৩. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.)

- (মৃত্যু: ৫৪ হিজরি / ৬৭৪ খ্রি.)

- **পরিচয়:** বনু লিহইয়ান গোত্রের সন্তান। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করে সুফফায় যোগ দেন (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৪/৮০)।

- **সুফফায় অবদান:** তিনি একাই বনু লিহইয়ানের সর্দার খালিদ ইবনে সুফিয়ানকে হত্যা করার গোপন অভিযানে যান এবং সফল হন, যা মদিনার নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাসূল (সা.) তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা

করেছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি লাঠি দিয়েছিলেন (বুখারি, ৪০৩৭-এর অর্থে)। ইলম ও আমলের অনন্য এ সমন্বয় ছিল।

২৪. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

- (মৃত্যু: ৭৩ হিজরি / ৬৯২ খ্রি.)
- **পরিচয়:** খলিফা উমর ফারুক (রা.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি বালক বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাবার পূর্বেই হিজরত করেন (জাহাবি, ১৯৯৮: ৩/২০৩)।
- **সুফফায় অবদান:** যদিও তিনি সর্বক্ষণ সুফফায় থাকতেন না, তবুও তিনি সুফফার ইলমী মজলিসের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, ইবাদত ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ তাঁকে মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মধ্যে উচ্চস্থান দিয়েছে। তিনি বিপুল সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ছিলেন কঠোরভাবে সুন্নাহর পাবন্দ।

২৫. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-জুহানী (রা.)

- (মৃত্যু: ৩২ হিজরি / ৬৫২ খ্রি.)
- **পরিচয়:** জুহাইনা গোত্রের সন্তান। মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাজিরদের সাথে থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি বদর যুদ্ধসহ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৪/২৭৬)।
- **সুফফায় অবদান:** তাঁর জীবনের অন্যতম গৌরব হলো, তিনি স্বপ্নে আযানের বাণী শুনেছিলেন এবং তা রাসূল (সা.)-কে জানালে রাসূল (সা.) বিলাল (রা.)-কে সে শব্দগুলোতে আযান দিতে বলেন (আবু দাউদ, ৪৯৯)। আযানের প্রচলনে এই সুফফাবাসীর অবদান অবিস্মরণীয়।

২৬. হজরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আসলামী (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)

- **পরিচয়:** আসলাম গোত্রের সন্তান। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মদিনায় এসে সুফফার সদস্য হন এবং রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞান অর্জন করেন (ইবনে আব্দুল বার, ১৯৯২: ১/৩২০)।

- **সুফফায় অবদান:** তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারি (রহ.) 'আল-আদাব আল-মুফরাদ'-এ তাঁর সূত্রে হাদিস সংকলন করেছেন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি শিক্ষা ও দানশীলতার চর্চা করতেন এবং মানুষকে দ্বীনের শিক্ষা দানে নিয়োজিত ছিলেন।

২৭. হজরত মুয়াজ ইবনে হারিস (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)

- **পরিচয়:** আনসার গোত্রের খাজরাজ বংশের সন্তান। তিনি ছিলেন তরুণ বয়সে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম এবং তাঁর পুরো পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ভ্রাতা আউফ ইবনে হারিস বদর যুদ্ধে শহীদ হন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/৪২২)।

- **সুফফায় অবদান:** তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি ফিকহ ও হাদিসের সবক গ্রহণ করেন এবং সুফফা ছেড়ে যাওয়ার পরও আমৃত্যু সে শিক্ষার প্রচার করে গেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

২৮. হজরত সায়িব ইবনে খাল্লাদ (রা.)

- (মৃত্যু: ৭১ হিজরি / ৬৯০ খ্রি.)

- **পরিচয়:** আবু সুফইয়ানের গোত্রে জন্ম নিলেও তিনি প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে সুফফার সদস্য হন। আবু হুরায়রা (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন (ইবনে হাজার, ১৯৯৮: ৩/২৫)।

- **সুফফায় অবদান:** দীর্ঘদিন রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে থেকে অসংখ্য হাদিস অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে তিনি বসরা শহরে গিয়ে সেখানে শিক্ষকতা ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদিসগুলো সহিহ সনদে প্রমাণিত।

২৯. হজরত সাবিত ইবনে ওয়াদিয়া (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)
- **পরিচয়:** খাজরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মসজিদে নববীতেই অবস্থান করতে থাকেন এবং আসহাবে সুফফার একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৬০)।
- **সুফফায় অবদান:** তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকি ও ইবাদতগুজার। রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে নেওয়া প্রতিটি শিক্ষা তিনি নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন এবং অন্যদের সে পথে আহ্বান জানাতেন।

৩০. হজরত উতাবাহ ইবনে গাযওয়ান (রা.)

- (মৃত্যু: ১৭ হিজরি / ৬৩৮ খ্রি.)
- **পরিচয়:** কুরাইশ বংশের সন্তান ও প্রাথমিক যুগের মুসলিম। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম দলের একজন এবং পরে মদিনায় হিজরত করে সুফফায় যোগ দেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৪/১৩০)।
- **সুফফায় অবদান:** অল্পতে তুষ্ট থাকায় তিনি ছিলেন অনন্য। খলিফা উমর (রা.)-এর সময়ে তিনি বসরা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর নিযুক্ত হন। বসরার মতো একটি বড় শহরের প্রশাসন চালিয়েও তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর বক্তৃতাগুলো দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতমুখিতার চেতনায় ভরপুর ছিল (মুসলিম, ২৯৬৭)।

৩১. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে বদর আল-জুহানী (রা.)

- (মৃত্যু: অজ্ঞাত)

- **পরিচয়:** জুহাইনা গোত্রের আরেকজন বিশিষ্ট সাহাবি। তিনি সুফফার সেইসব সদস্যদের মধ্যে ছিলেন যারা ভদ্রতা ও তাওয়াক্কুলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ডকুমেন্টের সীরাত-উদ্ধৃতিতে তাঁকে "ভদ্রতায় সমুদ্রের পরশমনি আর তাওয়াক্কুলে ঝিনুকের মোতির মত" বলা হয়েছে (সীরাতে মুস্তাফা, ৩৮৯-৩৯৫)।

- **সুফফায় অবদান:** তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে ইলম অর্জন করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও আল্লাহর প্রতি গভীর ভরসা অনেক বেদুঈনকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

৩২. হজরত আব্দুর রহমান ইবনে কাব (রা.)

- (তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত)

- **পরিচয়:** তিনি আসহাবে সুফফার সদস্য এবং 'জাইশ আল-উসরা' (তাবুক যুদ্ধ)-এ অংশ নিতে না পারার জন্য কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাওয়া সাতজন সাহাবির একজন, যাঁদের সম্পর্কে সূরা তাওবার ৯২ নম্বর আয়াত নাজিল হয় (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫: ৪/১৬২)।

- **সুফফায় অবদান:** চরম দারিদ্র্যের কারণে যুদ্ধে যাওয়ার বাহন না পেলেও তাঁর মনের ব্যথা ও ইখলাস আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তিনি পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পান এবং ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন।

আমরা এই জীবনী সংকলনে দেখলাম, আসহাবে সুফফা কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী ছিলেন না। তাদের মধ্যে ছিলেন আবিসিনিয়ার দাস, পারস্যের যুবরাজ, রোমান বণিক, কুরাইশ অভিজাত ও গৃহহীন বেদুঈন। কিন্তু ইসলামের ইলম ও ত্যাগের বন্ধনে তারা সবাই একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। আজকের দিনে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যই আমাদের জন্য বড় শিক্ষা।

এখন প্রশ্ন, আমরা কি এইসব জীবনী থেকে শুধু গল্প সংগ্রহ করছি, নাকি নিজেদের জীবনকে পাল্টানোর প্রেরণা নিচ্ছি? আমরা কি নিজেদের মধ্যে সেই ত্যাগ, সেই জ্ঞানার্জনের একনিষ্ঠতা আর সেই অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বাস্তবায়িত করতে পারবো? আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যতটুকু পারি, এই আদর্শকে ধারণ করব, এবং সমাজে ছড়িয়ে দেব। তবেই এ বই লেখা সার্থক হবে।

উপসংহার: সুফফা থেকে বিশ্বে, এক বিপ্লবের নীরব সূচনা

ইতিহাসের মহান বিপ্লবগুলোর কথা যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল সেনাবাহিনীর পদচারণা, রাজপ্রাসাদের পতন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর জয়-পরাজয়ের নাটকীয় মুহূর্ত। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস বাতলে দেয় এক ভিন্নতর বিপ্লবের কথা। এ বিপ্লবের সূচনা কোনো সিংহাসনের কাছ থেকে হয়নি, কোনো সেনানিবাস থেকেও নয়; বরং এর সূচনা হয়েছিল মদিনার এক মসজিদের পাশে খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া একটি মাটির মঞ্চ থেকে। সে মঞ্চের নাম ছিল 'সুফফা', আর তার বাসিন্দারা ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফা' নামে অমর হয়ে আছেন। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) যথার্থই বলেছেন, "সুফফা থেকে যে আলো ছড়িয়েছিল, তা শুধু আরব উপদ্বীপ নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল" (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৮)।

এই বইয়ের শেষ প্রান্তে এসে আমরা ফিরে তাকাই সেই সব অধ্যায়ের দিকে, যেখানে আমরা দেখেছি ত্যাগ ও ভালোবাসার ভিত্তিপ্রস্তর, ইলম ও ইবাদতের প্রাঙ্গণ, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের অনন্য বন্ধন এবং সর্বোপরি কর্ম ও প্রভাবে তাদের বিশ্বজয়ের কাহিনি। এখন সময় এসেছে, আমরা এই সমস্ত শিক্ষাকে একটি সুতোর মালায় গেঁথে, তা থেকে আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার।

আসহাবে সুফফার জীবনাদর্শের সারসংক্ষেপ

আসহাবে সুফফা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা নিছক একটি ঐতিহাসিক দল ছিলেন না। বরং তারা ছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের মূর্ত প্রতীক, যে দর্শনের ভিত্তি চারটি শক্ত স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান।

প্রথম স্তম্ভটি হলো ইলম বা জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ পিপাসা। আসহাবে সুফফা প্রমাণ করেছিলেন যে, জ্ঞানার্জন ইবাদতের চেয়ে কম মর্যাদার কিছু নয়। তারা দুনিয়ার সবকিছু ব্যবসা, সংসার, বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করে শুধুমাত্র কোরআন, হাদিস ও ইসলামী জ্ঞানের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.)-এর ভাষায়, "লোকেরা

বলে আমি অনেক হাদিস বর্ণনা করি। কিন্তু মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আনসার ভাইয়েরা খেজুর-বাগানে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ছিলাম একজন মিসকীন, যিনি পেটের তাগিদে রাসূল (সা.)-এর সাথে লেগে থাকতাম" (বুখারি, হাদীস: ১১৮)। এটি নিছক কোনো পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা ছিল না; এ ছিল জ্ঞানের প্রতি এক স্বেচ্ছায় উৎসর্গীকরণ। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী ড. স্পাহিচ ওমর যথার্থই বলেন, "সুফফা ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো আর্থিক ফি ছিল না, বরং ফি ছিল পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি" (Omer, ২০০৯: ১৪৫)। আজকের দিনে যখন শিক্ষা মানেই ডিগ্রি, আর ডিগ্রি মানেই চাকরি, তখন আসহাবে সুফফা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, জ্ঞানের একটি পবিত্রতর ও উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে তা হলো সত্যের সন্ধান, আত্মার বিকাশ এবং সৃষ্টির সেবা।

দ্বিতীয় স্তম্ভটি হলো ত্যাগ ও তিতিক্ষা। আসহাবে সুফফা ছিলেন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী একদল মানুষ। তাদের পরনে ছিল অর্ধ-ছেঁড়া কাপড়, পেটে ছিল তীব্র ক্ষুধার জ্বালা, এবং রাতের আশ্রয় ছিল মসজিদের খোলা বারান্দা। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, "আমি আসহাবে সুফফার সত্তরজনকে দেখেছি, যাদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না... তারা লজ্জা-স্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন" (বুখারি, হাদীস: ৪৪২)। কিন্তু এই দারিদ্র্য তাদের জন্য ছিল পরম সম্মানের বিষয়। তারা কখনো কারো কাছে হাত পাতেননি, বরং নিজেদের অভাব গোপন রেখেছেন। পবিত্র কোরআন তাদের সম্পর্কেই বলেছে: "অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে, কারণ তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না" (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)। আল্লাহর ওপর তাঁদের তাওয়াক্কুল বা পরম নির্ভরশীলতা ছিল এতটাই গভীর যে, তাঁদের ক্ষুধার কষ্ট সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "তোমরা যদি জানতে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কী প্রস্তুত রয়েছে, তাহলে তোমরা আরও দারিদ্র্য কামনা করতে" (তিরমিযি, হাদীস: ২৩৬৮)। এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা বর্তমান ভোগবাদী সমাজের সামনে এক জ্বলন্ত প্রশ্ন জীবনের প্রকৃত সম্পদ কী? বাহ্যিক প্রাচুর্য, না আত্মার প্রশান্তি?

তৃতীয় স্তম্ভটি হলো ভ্রাতৃত্ব ও সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন। আসহাবে সুফফার জীবন ছিল ভ্রাতৃত্বের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মদিনার ধনী আনসার সাহাবিরা তাদের মুহাজির ভাইদের সাথে নিজেদের সবকিছু ভাগ করে নিতেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা.)-এর মতো ধনী ব্যক্তি একাই আশিজনকে প্রতিরাতে মেহমানদারি করাতেন (ইবনে সা'দ, ১৯৬৮: ৩/৬১৫)। রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে একটি সুচারু ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যেখানে ধনীদের খাদ্য দরিদ্র জ্ঞানপিপাসুদের মাঝে বণ্টিত হতো। মসজিদের ছাদে ফলের থোকা ঝুলিয়ে রাখা হতো, যাতে আসহাবে সুফফা অবাধে তা খেতে পারেন। এটি ছিল সমাজের দুর্বল সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীলতার এক চমৎকার নমুনা। আল্লাহ তায়ালা এই ভ্রাতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, "আর তারা (আনসাররা) নিজেদের ওপর তাদের (মুহাজিরদের) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত" (সূরা আল-হাশর: ৯)। আধুনিক সমাজতত্ত্বের ভাষায় এটিকে বলা যায় 'কমিউনিটি-বেসড সোশ্যাল সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক', যেখানে রাষ্ট্র নয়, বরং ঈমান ও নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরাই সমাজের সুরক্ষা বেষ্টনী তৈরি করে।

চতুর্থ স্তম্ভটি হলো জ্ঞানের প্রসার ও সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা। আসহাবে সুফফা শুধু জ্ঞান অর্জন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁরা প্রশিক্ষিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন আরব উপদ্বীপের প্রান্তে প্রান্তে। কেউ হয়েছিলেন ইয়েমেনের গভর্নর ও বিচারক, যেমন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.); কেউ হয়েছিলেন পারস্যের বিজেতা ও কুফার প্রতিষ্ঠাতা, যেমন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.); কেউ হয়েছিলেন দামেস্কের প্রধান শিক্ষক ও বিচারপতি, যেমন আবু দারদা (রা.); আর কেউ বা হয়েছিলেন হাদিসের অমর বর্ণনাকারী, যেমন আবু হুরায়রা (রা.)। ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ বলেন, "সুফফা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম 'ক্যাডার কলেজ', যেখান থেকে ভবিষ্যতের প্রশাসক, বিচারক, সেনাপতি ও শিক্ষকগণ প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন" (হামিদুল্লাহ, ২০০৩: ১৫৮)। এই উত্তরাধিকার প্রমাণ করে যে, সত্যিকারের জ্ঞান কখনো গৃহবন্দী থাকে না; বরং তা বেরিয়ে আসে, সমাজ বদলায়, রাষ্ট্র গড়ে, এবং সভ্যতা নির্মাণ করে।

কীভাবে একজন সাধারণ শিক্ষার্থী তাদের থেকে জীবন বদলানোর মন্ত্র শিখতে পারে

আসহাবে সুফফার জীবন কোনো জাদুঘরে রাখা প্রাচীন নিদর্শন নয়। বরং তা বর্তমান সময়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য স্পন্দিত হৃদয়ের মতো সজীব। একুশ শতকের একজন

তরুণ বা তরুণী কীভাবে এই চৌদ্দ শ বছর আগের মানুষগুলোর কাছ থেকে জীবন বদলানোর মন্ত্র শিখতে পারে, তা নিয়ে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমত, শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা। আসহাবে সুফফার জ্ঞানার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীনের খেদমত করা। তাদের জ্ঞানার্জনের পেছনে কোনো চাকরি, ডিগ্রি বা পার্থিব সুনামের চিন্তা ছিল না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, "আমরা রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে একসাথে দশটি আয়াত শিখতাম। যতক্ষণ না আমরা সেগুলো জেনে তদনুযায়ী আমল করতাম, ততক্ষণ পরবর্তী দশটি আয়াত শিখতাম না" (আহমদ, হাদীস: ২২৯৪৫)। আজকের শিক্ষার্থীর জন্য এই শিক্ষা অমূল্য। ক্লাসে যাওয়ার আগে, পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার আগে, কিংবা কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে আমি কেন এটা শিখছি? এই প্রশ্ন নিয়তকে পরিশুদ্ধ করবে এবং জ্ঞানার্জনকে ইবাদতে পরিণত করবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীকে চর্চা করতে হবে তাওয়াক্কুল ও অল্পে তুষ্টির গুণ। আসহাবে সুফফার জীবন থেকে আমরা দেখেছি, তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও কখনো অনৈতিক পথে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবেননি, বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দিন কাটিয়েছেন। একজন আধুনিক শিক্ষার্থী যখন আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে, মেধা থাকা সত্ত্বেও সম্পদের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আসহাবে সুফফার এই তাওয়াক্কুল তাকে হতাশা থেকে রক্ষা করতে পারে। একইসাথে, অল্পে তুষ্টি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। ব্র্যান্ডের পোশাক না কিনতে পারার জন্য কষ্ট না করে, বরং আসহাবে সুফফার অর্ধ-ছেঁড়া কাপড়ের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ হওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও দেব" (সূরা ইবরাহীম: ৭)।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে হবে শিক্ষকের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের গুরুত্ব। আসহাবে সুফফার জ্ঞানার্জনের পদ্ধতির মূল ভিত্তি ছিল রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য (সোহবত)। তারা শুধু বই পড়ে বা লেকচার শুনে জ্ঞান অর্জন করেননি; বরং রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি নীরবতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

আধুনিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ভার্চুয়াল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আন্তরিকতার সেতু থাকা প্রয়োজন, তা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর দায়িত্ব হলো, জ্ঞানী, নেককার ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সান্নিধ্য খোঁজা। একজন ভালো শিক্ষক কেবল তথ্য দেন না, তিনি জীবন গড়ে দেন। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিক্ষকের সাহচর্য অপরিহার্য। বই কখনো শিক্ষকের স্থান নিতে পারে না" (আল-গাজালি, ২০০১: ১/৯৫)।

চতুর্থত, শিক্ষার্থীকে অবলম্বন করতে হবে 'আমলের সাথে ইলমের সমন্বয়'। আসহাবে সুফফা কখনো জ্ঞানকে আমল থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করতেন না। তারা যে আয়াত বা হাদিস শিখতেন, তা সাথে সাথে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতেন। আজকের শিক্ষার্থীরা অগাধ তথ্য ও জ্ঞান মুখস্থ করলেও, তা চরিত্রে প্রভাব ফেলে না। আমরা জানি সততা ভালো, কিন্তু পরীক্ষার হলে নকল করি; আমরা জানি সুদ হারাম, কিন্তু স্টুডেন্ট লোন বা ক্রেডিট কার্ডের সুদ এড়াতে চাই না। আসহাবে সুফফার জীবন আমাদের শেখায়, জ্ঞান তখনই মূল্যবান যখন তা চরিত্রে রূপ নেয়। একজন শিক্ষার্থী যদি প্রতিদিনের পড়া থেকে অন্তত একটি করে শিক্ষা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, তাহলে এক বছর পর তার জীবনে যে পরিবর্তন আসবে, তা বিস্ময়কর।

পঞ্চমত, শিক্ষার্থীকে হতে হবে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল। আসহাবে সুফফা পরবর্তী জীবনে যেখানেই গেছেন, সেখানেই সমাজের সেবা করেছেন, মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। একজন আধুনিক শিক্ষার্থীও তার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবা করতে পারে। একজন মেডিকেল ছাত্র বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প করতে পারে, একজন আইনের ছাত্র ফ্রি লিগ্যাল এইড দিতে পারে, একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র গ্রামের রাস্তাঘাট বা পানি নিষ্কাশনের সহজ সমাধান দিতে পারে। এভাবেই সে তার শিক্ষাকে 'সুফফা-ঘরানা' শিক্ষায় পরিণত করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী আলী শরীয়তি যথার্থই বলেছেন, "যে শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের ব্যথা অনুভব করে না, সে সমাজের সবচেয়ে বড় বোঝা" (Shariati, ১৯৭৯: ৪৫)।

সর্বোপরি, একজন শিক্ষার্থী যদি তার জীবনে একটি 'ব্যক্তিগত সুফফা' তৈরি করতে চায়, তাহলে তাকে তার দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যথা: (১)

প্রতিদিন ভোররাতে বা রাতে কিছু সময় শুধুমাত্র কোরআন ও হাদিস বোঝার জন্য নির্দিষ্ট করা। (২) মাসে অন্তত একবার রোজা রাখা, যাতে ক্ষুধার অনুভূতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত থাকে। (৩) নিয়মিত কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মজলিসে যাওয়া, অথবা অনলাইনে হলেও নির্ভরযোগ্য আলেমদের তাফসীর ও হাদিসের ক্লাস শোনা। (৪) নিজের আয়ের একটি অংশ (তা যতই কম হোক না কেন) নিয়মিত গরিব শিক্ষার্থী বা মাদরাসার জন্য দান করা। (৫) সোশ্যাল মিডিয়া বা অপ্রয়োজনীয় বিনোদনে ব্যয়িত সময় কমিয়ে তা ইলম অর্জনে ব্যয় করা। এই ছোট ছোট চর্চাগুলোই একজন শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে আধুনিক যুগের ‘সুফফাবাসী’-তে রূপান্তরিত করতে পারে।

আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সুফফার মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের আহ্বান

একটি বই লেখার মূল উদ্দেশ্য তখনই সফল হয়, যখন তার পাতা থেকে উৎসারিত চেতনা পাঠকের জীবনে প্রতিফলিত হয়। এই বইয়ের শেষ আহ্বান একটাই আসুন, আমরা নিজেদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সুফফার মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটাই। এটি শুধু কোনো এনজিও বা সরকারের কাজ নয়; এটি আমার, আপনার, আমাদের সবার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সুফফার মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটানোর অর্থ হলো, আমরা আমাদের জীবনযাত্রাকে পুনর্মূল্যায়ন করব। আমরা কি খুব বেশি ভোগবাদী হয়ে পড়েছি? আমাদের হাতে-কলমে যে জ্ঞান আছে, তা কি আমরা কেবল অর্থ উপার্জনের জন্যই ব্যবহার করছি, নাকি তা দিয়ে সমাজের কিছু সেবা করছি? আমাদের ঘরে যে আলমারি ভরা পোশাক, তার কতটুকু আমাদের সত্যিকারের প্রয়োজন? আর আমাদের শহরের ফুটপাতে যারা শীতের রাতে কাঁপে, তাদের জন্য আমাদের কি কোনো দায়িত্ব আছে? আসুন, আমরা সুফফার ত্যাগ ও তিতিক্ষার পাঠ নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র দান করে দিই। বছরে অন্তত এক মাস স্বেচ্ছায় সাধারণ জীবনযাপন করি, যাতে আমরা ভোগবাদের নেশা থেকে মুক্তি পেতে পারি। রাসূল (সা.) বলেছেন, “দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হওয়া তোমাদের অন্তরকে শান্তি দেবে এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহ তোমাদের জ্ঞানী করে তুলবে” (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪১০২, অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে)।

আমাদের পারিবারিক জীবনে সুফফার মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ অপরিহার্য। আমাদের সন্তানদের আমরা কেবল ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন দেখি, কিন্তু তাদের আমরা কি কোরআনের জ্ঞান, রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা, এবং আত্মত্যাগের মহিমা শেখাই? আসুন, আমাদের পরিবারগুলোতে একটি 'পারিবারিক সুফফা' তৈরি করি। সপ্তাহে একদিন পরিবারের সবাই মিলে বসে কোরআনের তাফসীর পড়ি, কোনো সহিহ হাদিসের গ্রন্থ থেকে শিক্ষা নিই, এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কে কীভাবে সমাজের সেবা করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের সন্তানদের আমরা নিয়মিত এতিমখানা বা গরিব এলাকায় নিয়ে যাই, যাতে তারা দুনিয়ার বাস্তবতা দেখে এবং তাদের অন্তরে সহমর্মিতা তৈরি হয়।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুফফার মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন একটি নীরব বিপ্লব। আমাদের শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে, তারা কেবল বেতনভুক কর্মচারী নন; বরং তারা হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আসহাবে সুফফার শিক্ষকগণ উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা.), এবং স্বয়ং রাসূল (সা.) নিজেরা জ্ঞান দানের কোনো মূল্য নিতেন না। আজকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে টিউশন ফি-র ঊর্ধ্বগতি শিক্ষাকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। যে শিক্ষকরা আছেন, তারা যদি সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু গরিব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পড়ানোর চেষ্টা করেন, যদি কোচিং বাণিজ্যের লোভ সংবরণ করেন, তাহলে শিক্ষাঙ্গনে সুফফার চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটতে পারে। শিক্ষার্থীদেরও উচিত, শিক্ষকদের সম্মান করা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেবল ডিগ্রি বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে না দেখে, বরং চরিত্র গঠনের কারখানা হিসেবে দেখা।

আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুফফার মূল্যবোধ বাস্তবায়ন করা সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। সমাজে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে, যে আছে এবং নাই-এর মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে, তার একমাত্র সমাধান হলো সুফফার মডেলের পুনর্জাগরণ। আমাদের সমাজের ধনী ব্যক্তিরা যদি সাদ ইবনে উবাদা (রা.)-এর মতো দানশীল হন, যদি তারা তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিতভাবে দরিদ্র শিক্ষার্থী ও অসহায়দের জন্য ব্যয় করেন, তাহলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য অনেকটাই লাঘব হতে পারে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের উচিত, নিজেদের

কারখানা ও অফিসের কর্মীদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি ও আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত, সুফফার আদলে 'ইলমি ওয়াকফ' বা শিক্ষা ট্রাস্ট তৈরি করা, যেখান থেকে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন: "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল যেন থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।" (সূরা আল-ইমরান: ১০৪)। আসহাবে সুফফা ছিলেন এই 'দল'-এর অনুসরণীয় মডেল। তারা শুধু নিজেরা ভালো ছিলেন না, বরং তারা সমাজের প্রতিটি স্তরে ভালোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

শেষ কথা

আসহাবে সুফফার জীবনাদর্শ আমাদের শেখায়, পরিবর্তন কখনো আকাশ থেকে পড়ে না। পরিবর্তন শুরু হয় একটি স্বপ্ন থেকে, একটি ত্যাগ থেকে, একটি জ্ঞানদীপ জ্বালানো থেকে। মসজিদে নববীর সেই খেজুর পাতার ছাউনির নিচে বসে আবু হুরায়রা (রা.) যখন ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাসূল (সা.)-এর মুখ থেকে একটি করে হাদিস মুখস্থ করছিলেন, তখন তিনি হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি যে, তাঁর সেই হাদিসগুলো একদিন কোটি কোটি মানুষের হৃদয় আলোকিত করবে। বিলাল (রা.) যখন 'আহাদ, আহাদ' জিকির করতে করতে রক্তাক্ত হতেন, তখন তিনি জানতেন না যে তাঁর সেই কণ্ঠ কিয়ামত পর্যন্ত আযানের সুরে বেজে চলবে। সালমান ফারসি (রা.) যখন সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি ভাবেননি যে তাঁর জীবনী 'তালিবে মওলা'-র সার্বজনীন প্রতীক হয়ে উঠবে।

ইতিহাসের এই মহামানবেরা আমাদের বার্তা দিয়ে গেছেন, "তোমরাও পারবে।" তোমরাও পারবে সমাজের আলোকবর্তিকা হতে। তোমাদেরও জীবনে থাকুক একটি 'সুফফা' ছোট হোক বা বড় যেখানে জ্ঞানের আলো জ্বলবে, ত্যাগের মহিমা ফুটে উঠবে, এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষ একাকার হবে। চৌদ্দ শ বছর আগের সেই ছাউনি দেওয়া মঞ্চ থেকে যে বিপ্লবের নীরব সূচনা হয়েছিল, তা আজও শেষ হয়ে যায়নি।

বরং তা আরও বিস্তৃত হওয়ার অপেক্ষায় আছে আমার হাতে, আপনার হাতে, আমাদের সবার হাতে।

আসুন, আমরা দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই আমরা জ্ঞানকে কেবল পেট ভরানোর উপায় বানাব না, বরং আত্মাকে জাগানোর উপকরণ বানাব। আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ করব না, বরং অভাবীর পাশে দাঁড়াব। আমরা শুধু নিজে শিখব না, বরং শেখাবোও। আমরা আমাদের পরিবার, শিক্ষাঙ্গন ও সমাজে সুফফার সেই সোনালি যুগের চেতনা জাগ্রত করব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আসহাবে সুফফার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দান কর। আমাদের অন্তরে ইলমের ভালোবাসা, ত্যাগের সাহস এবং ভ্রাতৃত্বের প্রশস্ততা দান কর। আমাদের জীবনকে তুমি কবুল করো, যেমন কবুল করেছিলে সুফফার সেই মেহমানদের জীবন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট ১: আসহাবে সুফফার পূর্ণাঙ্গ তালিকা (বিভিন্ন বর্ণনা মতে)

আসহাবে সুফফার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা ঐতিহাসিকদের জন্য একটি জটিল কাজ, কারণ তাদের সংখ্যা ছিল প্রবহমান কখনো বৃদ্ধি পেত, কখনো হ্রাস পেত। বিভিন্ন হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। নিচে বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করা হলো।

১.১ ভূমিকা ও পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা

হাফেজ আবু নুআইম আল-ইসফাহানি (রহ.) (মৃত্যু ৪৩০ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া'-তে আসহাবে সুফফার একটি তালিকা প্রদান করেছেন, যেখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ৭০ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আবু নুআইম, ২০০৮: ১/৩৩৮-৩৬০)। অপরদিকে, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) (মৃত্যু ৯১১ হি.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আসহাবে সুফফার মোট সংখ্যা ৪০০ পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা বলেছেন (সুয়ুতি, ১৯৯০: ৪৫)। এই সংখ্যার পার্থক্যের কারণ হলো, ৭০ জন ছিলেন স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক বাসিন্দা, আর বাকিরা ছিলেন বিভিন্ন সময়ে আগত প্রতিনিধি দলের সদস্য, যাঁরা সাময়িকভাবে সুফফায় অবস্থান করতেন।

নিচের তালিকাটি বিভিন্ন সূত্র একত্রিত করে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি নামের পাশে সংক্ষেপে পরিচিতি প্রদান করা হলো।

১.২ আসহাবে সুফফার তালিকা (বর্ণনাক্রমে)

নং	নাম	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	মৃত্যু (হি./খ্রি.)

১	**আবু হুরায়রা আদ-দাওসি (রা.)**	আসল নাম আব্দুর রহমান ইবনে সাখর। ইসলামের সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। সুফফার স্থায়ী সদস্য ও সেরা প্রতিনিধি।	৫৭/৬৭৮
২	**আবু উবাইদাহ আমির ইবনে জাররাহ (রা.)**	কুরাইশ নেতা, 'আশারা মুবাশশারা'র অন্যতম। রাসূল (সা.)-এর 'আমিন আল-উম্মাহ' (উম্মতের বিশ্বস্ত) উপাধিপ্রাপ্ত। সিরিয়ার গভর্নর।	১৮/৬৩৯
৩	**বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.)**	আবিসিনিয়ার কৃতদাস থেকে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। চরম নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের প্রতীক।	২০/৬৪১
৪	**সালমান আল-ফারসি (রা.)**	পারস্যের অগ্নিপূজক পরিবার থেকে সত্যের সন্ধানে। 'আহলে বাইতের সদস্য' হিসেবে স্বীকৃত। খন্দক যুদ্ধের পরিকল্পক। তাসাউফের ইমাম।	৩৬/৬৫৬
৫	**মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)**	ইলম ও ফিকহের পাহাড়। ইয়েমেনের গভর্নর ও বিচারক। রাসূল (সা.)-এর ভাষায় 'হালাল-হারামের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী'।	১৮/৬৩৯
৬	**আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)**	কোরআনের কারী ও তাফসিরবিদ। সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কোরআন তিলাওয়াতকারী। কুফার জ্ঞানকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।	৩২/৬৫৩

৭	**আবু জর আল-গিফারি (রা.)**	দুনিয়াবিমুখতার প্রতিমূর্তি। ধনীদের প্রতি কঠোর সোচ্চার এবং তাসাউফের প্রথম পথিকৃৎ।	৩২/৬৫২
৮	**হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)**	রাসূল (সা.)-এর গোপন তথ্যের রক্ষক ও মুনাফিক-বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী। গুপ্তচর ও মাদায়েনের গভর্নর।	৩৬/৬৫৬
৯	**মিকদাদ ইবনে আমর (রা.)**	বদর যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত সাহসিকতার ঘোষণা ইতিহাসখ্যাত। 'জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত' সাহাবি।	৩৩/৬৫৩
১০	**আবু দারদা (রা.)**	ব্যবসা ছেড়ে ইবাদতে মশগুল। দামেস্কের প্রধান বিচারপতি ও শিক্ষক। রাত-জাগা কুরআন তিলাওয়াতকারী।	৩২/৬৫২
১১	**সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)**	'আশারা মুবাশশারা'র অন্যতম। কাদেরিয়া যুদ্ধের নায়ক ও পারস্য বিজয়ী। কুফা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।	৫৫/৬৭৫
১২	**আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)**	ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শহীদ পরিবারের সন্তান। চরম নির্যাতিত সাহাবি ও কুফার গভর্নর।	৩৭/৬৫৭
১৩	**সুহাইব আর-রুমি (রা.)**	রোমান বংশোদ্ভূত ধনী সাহাবি। হিজরতের সময় যাবতীয় সম্পদ কুরাইশদের দিয়ে দিয়ে আসেন।	৩৮/৬৫৯

১৪	**জায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.)**	হজরত উমর (রা.)-এর ছোট ভাই। বীরযোদ্ধা এবং ইয়ামামার যুদ্ধের শহীদ।	১২/৬৩৩
১৫	**খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)**	তরবারি নির্মাতা ও দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে নির্যাতিত সাহাবি। কোরআনের প্রথম শিক্ষকদের একজন।	৩৭/৬৫৭
১৬	**আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)**	জন্মান্ধ মুয়াজ্জিন। সূরা 'আবাসা'র শানে নুযুলের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। কাদেরিয়া যুদ্ধে ইসলামী পতাকাবাহী শহীদ।	১৫/৬৩৬
১৭	**আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)**	উমর (রা.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র, নবী-অনুসরণের মূর্তপ্রতীক। ইবাদত ও হাদিস বর্ণনায় কঠোর পাবন্দ।	৭৩/৬৯২
১৮	**আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির (রা.)**	আনসার নেতা। বনু কুরাইজার ঘটনায় তাওবার জন্য নিজেকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ঘটনায় বিখ্যাত।	৫০/৬৭০
১৯	**সালিম মাওলা আবি হুজাইফা (রা.)**	হুজাইফা ইবনে ইয়ামানের মুক্তদাস। সমগ্র কোরআনের কারী ও সুফফার তাজবিদ বিশেষজ্ঞ।	১২/৬৩৩
২০	**উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)**	আকাবার প্রতিনিধি, বদর যুদ্ধের বীর। সুফফার প্রথম নিয়মিত প্রশিক্ষক ও লেখক।	৩৪/৬৫৪

২১	**সাফওয়ান ইবনে বায়যা (রা.)**	প্রাথমিক যুগের মুহাজির সাহাবি। বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।	অজ্ঞাত
২২	**আবু আবস ইবনে জুবায়র (রা.)**	কুরাইশ নেতা ও খন্দক যুদ্ধের বীর। মদিনায় হিজরত করে সুফফার স্থায়ী বাসিন্দা হন।	৩৪/৬৫৪
২৩	**উকাশা ইবনে মিহসান (রা.)**	বদর যুদ্ধের বীর। তাঁর হাতে রাসূল (সা.)-এর লাঠি 'গারকাদ' হয়ে গিয়েছিল। বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া ৭০ হাজারের অন্যতম।	১২/৬৩৩
২৪	**আবু কাবশাহ আল-আনমারি (রা.)**	রাসূল (সা.)-এর আযাদকৃত গোলাম। বিনয়, ইবাদত ও জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত।	অজ্ঞাত
২৫	**আবু মারসাদ কান্নাজ ইবনে হুসায়ন (রা.)**	আদাবি গোত্রের সন্তান। মুহাজির সাহাবি ও বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী।	১২/৬৩৩?
২৬	**মাসউদ ইবনে রবী কারী (রা.)**	বনী ওকায়েরের গোত্রপতি। সুফফার স্থায়ী বাসিন্দা ও কোরআনের কারী।	অজ্ঞাত
২৭	**সাওবান (রা.)**	রাসূল (সা.)-এর মুক্তদাস ও ব্যক্তিগত খাদেম। 'সাহিবে রাসূল' হিসেবে পরিচিত।	৫৪/৬৭৪
২৮	**মিসতাহ ইবনে উসাসা (রা.)**	কুরাইশ বংশের সাহাবি। ইফকের ঘটনায় অপবাদ রটনায় জড়িয়ে তাওবা করেন।	৩৪/৬৫৪

২৯	**উমায়র ইবনে আওফ (রা.)**	আনসার বংশীয় সাহাবি ও বদর যুদ্ধের সৈনিক।	অজ্ঞাত
৩০	**উয়ায়ম ইবনে সায়েদাহ (রা.)**	আনসার গোত্রের আউস বংশের সন্তান। সুফফার ইবাদতগুজার ছাত্র।	অজ্ঞাত
৩১	**সালিম ইবনে উমায়র (রা.)**	ওহুদ যুদ্ধের বীরযোদ্ধা। সুফফার স্থায়ী বাসিন্দা ও হাদিস বর্ণনাকারী।	অজ্ঞাত
৩২	**আবুল বাশআর কাব ইবনে আমর (রা.)**	নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী ও সুফফার একনিষ্ঠ বাসিন্দা।	অজ্ঞাত
৩৩	**খুবায়ব ইবনে সায়্যাফ (রা.)**	খন্দকের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী ও সুফফার স্থায়ী সদস্যদের অন্যতম।	অজ্ঞাত
৩৪	**আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.)**	একাই শত্রু সর্দার খালিদ ইবনে সুফিয়ানকে হত্যার গোপন অভিযানের নায়ক।	৫৪/৬৭৪
৩৫	**জুনদুব ইবনে জানাদাহ আল-গিফারি (রা.)**	আবু জর গিফারি (রা.)-এর সাথী ও দারিদ্র্যে ধৈর্যধারণকারী গিফারি সাহাবি।	অজ্ঞাত
৩৬	**উতবা ইবনে মাসউদ হুযালি (রা.)**	আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাই। কুফার পাঠাগার ও তাফসীর চর্চার প্রতিষ্ঠাতা।	অজ্ঞাত
৩৭	**আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-জুহানী (রা.)**	আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা সাহাবি। তাঁর স্বপ্নের ভিত্তিতেই ইসলামী আযানের প্রচলন হয়।	৩২/৬৫২

৩৮	**আবু মুসা আল-আশআরি (রা.)**	ইয়েমেনের আশআরি গোত্রের নেতা। বসরার গভর্নর ও বিশিষ্ট ফকিহ।	৪২/৬৬২
৩৯	**ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.)**	সুফফার দারিদ্র্য ও ত্যাগের বর্ণনাকারী সাহাবি। দীর্ঘজীবী সাহাবিদের অন্যতম।	৮৩/৭০২
৪০	**ফাদ্বালাহ ইবনে উবাইদ (রা.)**	সুফফার নামাজে অজ্ঞান হয়ে পড়ার ঘটনার বর্ণনাকারী।	৫৩/৬৭৩
৪১	**আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা.)**	ফলের থোকা ঝোলানোর ঘটনার বর্ণনাকারী ও বহু যুদ্ধের সৈনিক।	৭৩/৬৯২
৪২	**আব্দুর রহমান ইবনে কাব (রা.)**	তাবুক যুদ্ধে না যেতে পেরে ক্রন্দনকারী সাহাবি, যাদের বিষয়ে সূরা তাওবার ৯২ নং আয়াত নাজিল হয়।	অজ্ঞাত
৪৩	**আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)**	তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের সাহাবি ও সুফফার সদস্য।	৬০/৬৮০
৪৪	**হাজ্জাজ ইবনে আমর আসলামী (রা.)**	নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী ও সুফফার সদস্য।	অজ্ঞাত
৪৫	**মুয়াজ ইবনে হারিস (রা.)**	খাজরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি। সুফফার ফিকহ ও হাদিসের শিক্ষক।	অজ্ঞাত
৪৬	**সায়িব ইবনে খাল্লাদ (রা.)**	আবু হুরায়রা (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বসরার শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে নিযুক্ত।	৭১/৬৯০

৪৭	**সাবিত ইবনে ওয়াদিয়া (রা.)**	মুত্তাকি ও ইবাদতগুজার আনসার সাহাবি।	অজ্ঞাত
৪৮	**উতাবাহ ইবনে গাযওয়ান (রা.)**	কুরাইশ সাহাবি। বসরা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর। অল্পে তুষ্টিতে অনন্য।	১৭/৬৩৮
৪৯	**আব্দুল্লাহ ইবনে বদর আল-জুহানী (রা.)**	ভদ্রতা ও তাওয়াক্কুলের জন্য বিখ্যাত জুহাইনা গোত্রের সাহাবি।	অজ্ঞাত
৫০	**শোয়াইব (রা.)**	সুফফার সেরা শিক্ষার্থীদের একজন, ইবাদত ও ইলমের জন্য নিবেদিতপ্রাণ।	অজ্ঞাত
৫১	**ফুদ্বালা ইবনে ওবায়দ (রা.)**	মিশর অভিযানের অন্যতম নেতা ও মুহাদ্দিস।	৫৩/৬৭৩
৫২	**সা'দ ইবনে মালিক (রা.)**	বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী ও সুফফার স্থায়ী সদস্যদের অন্যতম।	অজ্ঞাত
৫৩	**আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রা.)**	দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবি; রাসূল (সা.)-এর কাছে ভবিষ্যতের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী।	৫৮/৬৭৮
৫৪	**উকবা ইবনে আমির আল-জুহানী (রা.)**	রাসূল (সা.)-এর কাতিবে ওহি ও অশ্বারোহী বীর। মিশরের গভর্নর।	৫৮/৬৭৮
৫৫	**রাফে' ইবনে আবু রাফে' (রা.)**	রাসূল (সা.)-এর খাদেম। তাবুক যুদ্ধের সৈনিক ও সুফফার বাসিন্দা।	অজ্ঞাত

৫৬	**বিশর ইবনে বারা (রা.)**	খাইবারের যুদ্ধে বিষ মেশানো গোশত খেয়ে শাহাদাত বরণকারী সাহাবি।	৭/৬২৮
৫৭	**ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা.)**	‘সুফফার দরিদ্র’ হিসেবে পরিচিত। রাসূল (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়তের বর্ণনাকারী।	৭৫/৬৯৪
৫৮	**আবু রিমসা (রা.)**	সুফফার অন্যতম সদস্য ও চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ সাহাবি।	অজ্ঞাত
৫৯	**হারিসা ইবনে নুমান (রা.)**	দীর্ঘ ইবাদত ও সেবার জন্য বিখ্যাত আনসার সাহাবি।	অজ্ঞাত
৬০	**জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)**	প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফতি। পিতার সাথে সুফফায় অবস্থান করতেন।	৭৮/৬৯৭
৬১	**সালমা ইবনে আকওয়া (রা.)**	দ্রুতগামী অশ্বারোহী ও বীরযোদ্ধা। সুফফার সার্বক্ষণিক ছাত্র।	৭৪/৬৯৩
৬২	**আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ (রা.)**	বদর যুদ্ধের বীর ও শহীদ সাহাবি।	২/৬২৪
৬৩	**আওস ইবনে সামিত (রা.)**	উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর ভাই। ইবাদত ও জ্ঞানচর্চার জন্য সুফফায় স্থায়ী।	অজ্ঞাত
৬৪	**নুআইম ইবনে মাসউদ (রা.)**	খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ ও বনু কুরাইজার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী গোপন প্রতিনিধি।	৩৫/৬৫৫

৬৫	**আবুল হাইসাম মালিক ইবনে তায়্যিহান (রা.)**	বদর ও অন্যান্য যুদ্ধের বীর এবং রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি।	৩৭/৬৫৭
৬৬	**লাবিদ ইবনে রাবিআ (রা.)**	আনসার সাহাবি ও সুফফার জ্ঞানী ছাত্রদের অন্যতম।	অজ্ঞাত
৬৭	**আমর ইবনে আবাসা (রা.)**	সুফফার স্থায়ী বাসিন্দা। দীর্ঘ ইবাদত ও ত্যাগের জন্য বিখ্যাত।	৬০/৬৮০
৬৮	**আবু কুরাইরা (রা.)**	সুফফার অন্যতম সদস্য এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্যকারী বীর।	অজ্ঞাত
৬৯	**হানজালা আল-গাসিল (রা.)**	ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হবার পর ফেরেশতারা যাঁকে গোসল দিয়েছিলেন।	৩/৬২৫
৭০	**সুবাই ইবনে হাতিব (রা.)**	বদর যুদ্ধ ও অন্যান্য অভিযানের সৈনিক; সুফফার স্থায়ী ছাত্র।	অজ্ঞাত

তথ্যসূত্র ও নোট:

১. উপরোক্ত তালিকাটি প্রস্তুত করতে হাফেজ আবু নুআইম (রহ.)-এর ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ (১/৩৩৮-৩৬০), ইবনে সা'দ (রহ.)-এর ‘আত-তাবাকাত আল-কুবরা’, ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-এর ‘আল-ইসাবা ফি তাময়িজ আল-সাহাবা’ এবং ড. আকবার শাহ নাজিবাবাদি (রহ.)-এর ‘তারীখ-ই-ইসলাম’ গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

২. যেসকল সাহাবির নামের পাশে ‘অজ্ঞাত’ , তা ইতিহাসের গর্ভে সঠিক সন সংরক্ষিত না থাকার কারণে। এটি নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষকের কাজ করার সুযোগ আছে।

১.৩ সংখ্যার তারতম্যের কারণ ও ব্যাখ্যা

উপরোক্ত তালিকাটি হাফেজ আবু নুআইম (রহ.)-এর ৭০ জনের সূত্র, ইমাম সুয়ুতি (রহ.)-এর ৪০০ জনের বর্ণনা, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ (ইবনে সা'দ, ইবনে আব্দুল বার, ইবনে হাজার আসকালানি প্রমুখ) পর্যালোচনা করে সংকলিত। উল্লেখ্য যে, তালিকায় প্রদত্ত নামগুলোর অনেকগুলোর বানান ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কিছু সাহাবি যাঁরা পরবর্তী জীবনে ধনী ও প্রভাবশালী হয়েছেন (যেমন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর), তাঁরা সুফফার স্থায়ী বাসিন্দা নন, বরং নিয়মিত আগত শিক্ষার্থী ও দাতা হিসেবে এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "সুফফা ছিল একটি বিষয়ভিত্তিক অবস্থান, বংশগত বা স্থায়ী আবাসিক মর্যাদা নয়। যাঁরা জ্ঞান ও ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করতেন, তাঁরাই এর অন্তর্ভুক্ত" (ইবনে তাইমিয়া, ১৯৮৭: ১১/১০)। সুতরাং, সুফফার সদস্যপদ ছিল একটি গতিশীল ধারণা।

পরিশিষ্ট ২: আসহাবে সুফফা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের আরবি-বাংলা সংকলন

এ সংকলনে আসহাবে সুফফা সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের আরবি ইবারত, বাংলা অনুবাদ ও সূত্র প্রদান করা হলো।

২.১ সূরা বাকারার ২৭৩ নং আয়াত

আরবি:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(سورة البقرة: ٢٧٣)

বাংলা অনুবাদ:

"(সাদাকা) সেইসব অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত যে, তারা জমিনে চলাফেরা করতে পারে না (জীবিকার সন্ধানে)। অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে, কারণ তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না। তুমি তাদের চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দেখে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দার মতো ভিক্ষা করে না। আর তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।" (সূরা আল-বাকারা: ২৭৩)

শানে নুযুল ও ব্যাখ্যা:

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এই আয়াতটি আসহাবে সুফফা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে (ইবনে কাসীর, ১৯৯৯: ১/৫৫৬)। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, "এখানে এমন একটি জাতির কথা বলা হয়েছে, যারা ইলম ও জিহাদের জন্য নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ করে রেখেছে" (কুরতুবী, ২০০৩: ৩/৩৪০)।

২.২ আসহাবে সুফফার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বর্ণনা

আরবি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.
(صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، ٤٤٢)

বাংলা অনুবাদ:

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আসহাবে সুফফার সত্তরজনকে দেখেছি, তাদের কারো গায়ে বড় চাদর (রিদা) ছিল না। হয়তো ছিল কেবল তহবন্দ (ইজার) কিংবা ছোট চাদর (কিসা), যা তারা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। কারো পায়ের নিসফে সাক (অর্ধ-হাঁটু) পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছাত। তারা লজ্জা-স্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।" (সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া, হাদীস: ৪৪২)

২.৩ আবু হুরায়রা (রা.)-এর পেটে পাথর বাঁধার বর্ণনা

আরবি:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ، وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ...
(سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٣٦٨)

বাংলা অনুবাদ:

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আসহাবে সুফফা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের নির্ভর করার মতো পরিবার-স্বজন বা ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই! আমি ক্ষুধার জ্বালায় নিজের

পেট মাটিতে চেপে ধরে থাকতাম এবং কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম, যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি..." (জামে তিরমিযি, অধ্যায়: যুহদ, হাদীস: ২৩৬৮) [হাদীসটি হাসান সহীহ]

২.৪ এক পেয়ালা দুধের মু'জিজা

আরবি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ... فَقَالَ: ¼أَبَا هُرَيْرَةَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ¬... فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يُرْوَى ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ... فَقَالَ: ¼أَبَا هُرَيْرَةَ اشْرَبْ¬ فَشَرِبْتُ... حَتَّى قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا... صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، ٦٤٥٢)

বাংলা অনুবাদ:

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত... রাসূল (সা.) বললেন, "হে আবু হুরায়রা! সুফফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে এসো।" ... আমি একে একে প্রত্যেককে পান করাতে লাগলাম। প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালা ফিরত দিত। এভাবে সবাই তৃপ্ত হল। ... তারপর রাসূল (সা.) বললেন, "হে আবু হুরায়রা! এবার তুমি পান কর।" আমি পান করলাম। তিনি বলতে থাকলেন, "আরো পান কর।" অবশেষে আমি বললাম, "যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আমার পেটে আর জায়গা নেই।" (সহীহ বুখারী, অধ্যায়: রিকাক, পরিচ্ছেদ: নবী ও তাঁর সাহাবিদের জীবনযাপন, হাদীস: ৬৪৫২)

২.৫ রাসূল (সা.)-এর সান্ত্বনা: "আরও দারিদ্র্য কামনা করতে"

আরবি:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ

الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ¼لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً¼

(سنن الترمذي، كتاب الزهد، ٢٣٦٨)

বাংলা অনুবাদ:

ফাদ্বালাহ ইবনে উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) লোকদের নামাজ পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফফা। এমনকি বেদুঈনরা বলত, 'এরা পাগল'। ... তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চেয়েও বেশি অভাব ও দারিদ্র্য কামনা করতে।'" (জামে তিরমিযি, অধ্যায়: যুহদ, ২৩৬৮) [হাদীসটি হাসান সহীহ]

২.৬ আনসারগণ কর্তৃক ফলের থোকা ঝোলানো

আরবি:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ: ¼لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا¬
(سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب إخراج الرديء في الصدقة، ٢٥٢٤)

বাংলা অনুবাদ:

আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) একদিন মসজিদে এলেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। এক ব্যক্তি নষ্ট খেজুরের একটি থোকা (রশিতে) ঝুলিয়েছিল। তিনি সেই থোকায় লাঠি লাগিয়ে বললেন, 'এই সদকাকারী যদি চাইত, তাহলে এর চেয়ে ভালো থোকা সদকা করতে পারত।'" (সুনান নাসাঈ, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ: সদকায় নিকৃষ্ট জিনিস প্রদান, ২৫২৪)

পরিশিষ্ট ৩: আসহাবে সুফফা নির্বাচিত গবেষণা পত্র: একটি পর্যালোচনা

আসহাবে সুফফা নিয়ে আধুনিক একাডেমিক গবেষণা খুব একটা সমৃদ্ধ নয়, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়। কিন্তু আরবি, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। এ পরিশিষ্টে তেমনি কয়েকটি নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধ ও অধ্যায়ের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ: "আসহাবে সুফফা: ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"

উৎস: হামিদুল্লাহ, এম. (২০০৩)। *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রচিন্তা* (বাংলা অনুবাদ)। কায়রো: দার আল-ফিকর। [মূল ফরাসি ও ইংরেজি সংস্করণও বিদ্যমান]

সারসংক্ষেপ:

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ (মৃত্যু ২০০২) তাঁর গবেষণায় আসহাবে সুফফাকে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি কৌশলগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি দেখান যে, সুফফা ছিল রাসূল (সা.)-এর সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ, যেখানে ভবিষ্যতের প্রশাসক, বিচারক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তিনি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'প্রথম ইসলামী সিভিল সার্ভিস একাডেমি' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সুফফার শিক্ষার্থীরা ছিল প্রথম 'বৃত্তিপ্রাপ্ত' শিক্ষার্থী, যাদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করত (হামিদুল্লাহ, ২০০৩: ১৫৮-১৭৫)।

মূল্যায়ন:

ড. হামিদুল্লাহর এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনিই প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চশমায় সুফফাকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর তথ্যনির্ভর উপস্থাপনা ও প্রাথমিক উৎসের ওপর গভীর নির্ভরতা গবেষণাটিকে নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। তবে তিনি সুফফার আধ্যাত্মিক দিকটির চেয়ে প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় দিকটির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন।

৩.২ ড. স্পাহিচ ওমর: "The Suffa: A Prototype of the First Islamic Madrasah"

উৎস: Omer, S. (২০০৯). The Suffa: A Prototype of the First Islamic Madrasah. In *The History and Character of the Islamic Built Environment* (pp. ১৩৮-১৬৮). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

সারসংক্ষেপ:

মালয়েশিয়ার স্থাপত্য ইতিহাসবিদ ড. স্পাহিচ ওমর তাঁর এ গবেষণায় সুফফার স্থাপত্যিক ও শিক্ষাগত গুরুত্ব পর্যালোচনা করেছেন। তিনি যুক্তি দেন যে, আধুনিক যুগের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যিক ধারণার মূল উৎস হলো এই সুফফা। তিনি দেখান, কীভাবে মসজিদের সাথে একটি আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্রের সংযুক্তি পরবর্তীকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে অনুসৃত হয়েছে। তাঁর মতে, সুফফা ছিল 'মসজিদ-মাদরাসা কমপ্লেক্স'-এর আদি নমুনা, যা পরে আল-আজহার, জায়তুনা, কাইরুয়ান প্রভৃতি স্থানে বিকশিত হয়েছে (Omer, ২০০৯: ১৩৮-১৬৮)।

মূল্যায়ন:

ড. ওমর-এর গবেষণা একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুফফাকে উপস্থাপন করেছে। তাঁর স্থাপত্য বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি প্রাথমিক আরবি উৎসের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ইংরেজি উৎসের ওপর নির্ভর করেছেন, যা কিছুটা দুর্বলতা।

৩.৩ ড. এম. এম. আখতার: "আসহাবে সুফফা: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"

উৎস: আখতার, এম. এম. (২০০৫)। আসহাবে সুফফা: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল,* ২৩(২), ৪৫-৬৮।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশের এ গবেষক তাঁর প্রবন্ধে আসহাবে সুফফার সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে একটি নবগঠিত রাষ্ট্রে দরিদ্র, গৃহহীন ও ভিন্ন গোত্রের মানুষদের একত্রিত করে একটি সম্মিলিত পরিচয় গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি 'সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন' (সামাজিক স্তরবিন্যাস) তত্ত্বের আলোকে দেখান যে, সুফফা ছিল একটি 'ইগালিটারিয়ান' (সাম্যবাদী) প্রতিষ্ঠান, যেখানে জাতি-বর্ণ-ধন-দারিদ্র্যের সব ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল (আখতার, ২০০৫: ৫০)।

মূল্যায়ন:
গবেষণাটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী। তবে লেখক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রয়োগে কিছুটা সরলীকরণ করে ফেলেছেন এবং প্রাথমিক ঐতিহাসিক উৎসগুলোর সাথে তত্ত্বের সমন্বয় আরও নিবিড় হতে পারত।

৩.৪ আব্দুল্লাহ নাওয়াব: "সুফফা: দ্য ফার্স্ট রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি ইন ইসলাম"

উৎস: নাওয়াব, এ. (১৯৮৯)। *আসহাবে সুফফা: ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়*। করাচি: ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন।

সারসংক্ষেপ:
পাকিস্তানি গবেষক আব্দুল্লাহ নাওয়াব তাঁর এ পুস্তিকায় সুফফাকে ইসলামের প্রথম 'রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি সুফফার শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষকবৃন্দ, এবং ছাত্রদের জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন সাহাবির জীবনী থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁরা সুফফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্র্যাজুয়েট'-এর মতো কাজ করেছেন (নাওয়াব, ১৯৮৯: ২৫-৫৫)।

মূল্যায়ন:
এটি একটি জনপ্রিয় ধাঁচের গবেষণা, একাডেমিক কঠোরতায় নয়। তথ্যসূত্রের যথাযথ ব্যবহার কম, তবে সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য। তথ্যগত কিছু ত্রুটি আছে, তবে সুফফার শিক্ষা মডেল বোঝার জন্য প্রাথমিক পাঠ হিসেবে ভালো।

৩.৫ ড. ইমরান খান: "The Economic Model of Ashab al-Suffa: A Historical Analysis"

উৎস: খান, আই. (২০১৫)। The Economic Model of Ashab al-Suffa: A Historical Analysis. *Journal of Islamic Economics*, ৮(১), ২২-৪০।

সারসংক্ষেপ:

এ গবেষণায় লেখক আসহাবে সুফফার অর্থনৈতিক মডেল নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সুফফার অর্থনীতি ছিল ত্রিমুখী রাষ্ট্রীয় (বায়তুল মাল থেকে), সামাজিক (আনসারদের দান), এবং ব্যক্তিগত (সুফফাবাসীদের নিজস্ব ক্ষুদ্র উপার্জন)। তিনি একে আধুনিক 'ওয়ার্কফেয়ার' মডেলের সাথে তুলনা করে বলেন, এখানে দান গ্রহণের পাশাপাশি কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার শিক্ষাও দেওয়া হতো (খান, ২০১৫: ৩০-৩৫)।

মূল্যায়ন:

গবেষণাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী। আধুনিক অর্থনীতির তত্ত্বের সাথে প্রাচীন ইসলামী মডেলের সমন্বয়ের প্রয়াস প্রশংসনীয়। তবে কিছু আধুনিক পরিভাষা প্রাচীন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে গিয়ে কিছুটা অসঙ্গতি তৈরি হয়েছে।

৩.৬ সার্বিক মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, আসহাবে সুফফা নিয়ে গবেষণা এখনো প্রাথমিক স্তরে আছে। ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গবেষণা হতে পারে: (১) সুফফার শিক্ষা কারিকুলামের সাথে আধুনিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। (২) সুফফাবাসীদের বর্ণিত হাদিসের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ। (৩) সুফফা ও পরবর্তী সুফি তরিকাসমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতার সূত্রনির্ধারণ। (৪) বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ রচনা।

পরিশিষ্ট ৪: গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

এই পরিশিষ্টে বইটি রচনায় ব্যবহৃত সকল উৎসের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করা হলো। উৎসগুলোকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: (ক) প্রাথমিক উৎস (কোরআন ও হাদিস গ্রন্থ), (খ) ধ্রুপদী ইসলামী উৎস (তাফসীর, সীরাত, ইতিহাস ও তাবাকাত), (গ) আধুনিক আরবি ও উর্দু গ্রন্থ, (ঘ) ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এবং (ঙ) বাংলা ভাষার সূত্রসমূহ।

৪.১ প্রাথমিক উৎস: কোরআন ও হাদিস গ্রন্থ

- আল-কুরআন আল-করীম।
- বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (১৯৯৭)। *সহীহ আল-বুখারি* (আরবি-বাংলা)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- মুসলিম, ইবনে আল-হাজ্জাজ (২০০০)। *সহীহ মুসলিম* (আরবি-বাংলা)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- তিরমিযি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (১৯৯৬)। *সুনান আল-তিরমিযি* (আরবি)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশআস (১৯৯৭)। *সুনান আবি দাউদ* (আরবি)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- নাসাঈ, আহমদ ইবনে শুআইব (১৯৯৬)। *সুনান আন-নাসাঈ* (আরবি)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ (১৯৯৭)। *সুনান ইবনে মাজাহ* (আরবি)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- আহমদ ইবনে হাম্বল (১৯৯৮)। *মুসনাদ আল-ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল* (আরবি)। বৈরুত: মুআসসাসাত আল-রিসালাহ।

- তাবারানি, সুলাইমান ইবনে আহমদ (১৯৯৬)। *আল-মু'জাম আল-কাবির* (আরবি)। মসুল: মাকতাবাত আল-যাহরা।
- আল-হাকিম, আবু আব্দুল্লাহ (১৯৯০)। *আল-মুস্তাদরাক আলা আল-সহীহাইন* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- হাইসামি, নূর উদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর (১৯৯৪)। *মাজমা' আয-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-ফিকর।

৪.২ ধ্রুপদী ইসলামী উৎস: তাফসীর, সীরাত, ইতিহাস ও তাবাকাত

- ইবনে কাসীর, ইসমাইল ইবনে উমর (১৯৯৯)। *তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম* (আরবি)। রিয়াদ: দার তাইয়্যিবা।
- ইবনে কাসীর, ইসমাইল ইবনে উমর (১৯৯৯)। *আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া* (আরবি)। কায়রো: দার হাজার।
- কুরতুবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (২০০৩)। *আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন* (আরবি)। রিয়াদ: দার আলাম আল-কুতুব।
- সুয়ুতি, জালালুদ্দিন (১৯৯০)। *আদ-দুর আল-মানসুর ফি আল-তাফসির বিল-মাসুর* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- ইবনে হিশাম, আব্দুল মালিক (১৯৫৫)। *আস-সীরাহ আন-নববিয়্যাহ* (আরবি)। কায়রো: মাকতাবাত মুস্তাফা আল-বানি।
- তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে জারির (১৯৮৭)। *তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলুক* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ (১৯৬৮)। *আত-তাবাকাত আল-কুবরা* (আরবি)। বৈরুত: দার সাদের।

- ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ (১৯৯২)। *আল-ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাত আল-আসহাব* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-জিল।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আহমদ ইবনে আলী (১৯৯৮)। *আল-ইসাবা ফি তাময়িজ আল-সাহাবা* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আহমদ ইবনে আলী (২০০১)। *ফাতহুল বারী শরহ সহীহ বুখারী* (আরবি)। রিয়াদ: দারুস সালাম।
- জাহাবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (১৯৯৮)। *সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা* (আরবি)। বৈরুত: মুআসসাসাত আল-রিসালাহ।
- আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ (২০০৮)। *হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- আল-ওয়াকিদি, মুহাম্মদ ইবনে উমর (১৯৮৯)। *আল-মাগাজি* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-আ'লামি।
- আল-বালাযুরি, আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া (১৯৯৬)। *আনসাব আল-আশরাফ* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-ফিকর।
- আল-বালাযুরি, আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া (১৯৮৮)। *ফুতুহ আল-বুলদান* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
- আল-সামহুদি, নূর উদ্দিন আলী (২০০৬)। *ওয়াফা আল-ওয়াফা বি-আখবার দার আল-মুস্তফা* (আরবি)। মদিনা: মাকতাবাত আল-আসাদি।
- ইবনে আসাকির, আলী ইবনে হাসান (১৯৯৫)। *তারীখ মাদিনাত দিমাশক* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-ফিকর।
- ইবনে তাইমিয়া, আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম (১৯৮৭)। *মাজমু আল-ফাতাওয়া* (আরবি)। মদিনা: মুজাম্মা' আল-মালিক ফাহাদ।

- ইবনে কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (২০০৩)। *আত-তিব্ব আন-নববী* (আরবি)। কায়রো: দার আল-হাদিস।

- ইবনে কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (২০০৫)। *জাদ আল-মাআদ ফি হাদি খাইর আল-ইবাদ* (আরবি)। বৈরুত: মুআসসাসাত আল-রিসালাহ।

- আল-গাজালি, আবু হামিদ (২০০১)। *ইহইয়া উলুম আল-দিন* (আরবি)। কায়রো: দার আল-মা'রিফা।

- আল-কালাবাজি, আবু বকর (১৯৯৩)। *আত-তাআররুফ লি-মাজহাব আহলে তাসাউফ* (আরবি)। কায়রো: মাকতাবাত আল-খানজি।

- ইবনে মানজুর, মুহাম্মদ ইবনে মুকরাম (১৯৯৩)। *লিসান আল-আরব* (আরবি)। বৈরুত: দার সাদের।

- আল-ফিরোজাবাদি, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব (২০০৫)। *আল-কামুস আল-মুহিত* (আরবি)। বৈরুত: মুআসসাসাত আল-রিসালাহ।

৪.৩ আধুনিক আরবি ও উর্দু গ্রন্থ

- আল-বুতি, মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান (২০০১)। *ফিকহ আস-সীরাহ* (আরবি)। দামেস্ক: দার আল-ফিকর।

- আল-গাজালি, মুহাম্মদ (২০০১)। *ফিকহ আস-সীরাহ* (আরবি)। কায়রো: দার আল-শুরুক।

- আল-জুহাইলি, ওয়াহবা (২০০২)। *আত-তাফসীর আল-মুনির* (আরবি)। দামেস্ক: দার আল-ফিকর।

- আল-কাদি, ইয়াদ (২০০৭)। *মসজিদে নববীর স্থাপত্য ও ইতিহাস* (আরবি)। মদিনা: দার আল-মাদিনাহ আল-মুনাওয়ারা।

- ইবনে জাবালা, আব্দুল্লাহ (১৯৮৮)। *তারীখ আল-মাদিনা* (আরবি)। বেনগাজি: দার আল-মুআররিখ।

- নাজিবাবাদি, আকবর শাহ (২০০০)। *তারীখ-ই-ইসলাম* (উর্দু)। লাহোর: মাকতাবা রাশীদিয়া।
- নাওয়াব, আব্দুল্লাহ (১৯৮৯)। *আসহাবে সুফফা: ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়* (উর্দু)। করাচি: ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন।
- সাল্লাবি, আলী মুহাম্মদ (২০০৬)। *উমর ইবনুল খাত্তাব: শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু* (আরবি)। বৈরুত: দার আল-মা'রিফা।
- কাদরী, মুহাম্মদ তাহির (২০০৬)। *সীরাতুর রাসূল (সা.)* (উর্দু/ইংরেজি)। লাহোর: মিনহাজুল কোরআন পাবলিকেশন্স।

৪.৪ ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

- Watt, W. M. (1956). *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon Press.
- Omer, S. (2009). *The History and Character of the Islamic Built Environment*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Hamidullah, M. (1987). *The Economic System of Islam*. Paris: Centre for Islamic Studies.
- Shariati, A. (1979). *On the Sociology of Islam*. Berkeley: Mizan Press.
- White, J. (2004). *Boarding School Blues: Revisiting the American Indian Educational Experiment*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Medina, J. (2008). *Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School*. Seattle, WA: Pear Press.

- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Khan, I. (2015). The Economic Model of Ashab al-Suffa: A Historical Analysis. *Journal of Islamic Economics*, 8(1), 22-40.

৪.৫ বাংলা ভাষার সূত্রসমূহ

- আখতার, এম. এম. (২০০৫)। আসহাবে সুফফা: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। *ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল*, ২৩(২), ৪৫-৬৮।
- হামিদুল্লাহ, মুহাম্মদ (২০০৩)। *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রচিন্তা* (বাংলা অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম)। কায়রো: দার আল-ফিকর।
- ইকবাল, মুহাম্মদ (২০১০)। *ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন* (বাংলা অনুবাদ: গোলাম মোস্তফা)। দিল্লি: কিতাব ভবন।
- আল-আত্তাস, সৈয়দ মুহাম্মদ নকিব (২০১১)। *ইসলামী শিক্ষা দর্শন* (বাংলা অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম)। কুয়ালালামপুর: আইএসটি।
- সীরাত বিশ্বকোষ (২০১৫)। 'আসহাবে সুফফা' ভুক্তি (খন্ড ২, পৃ. ৩৮৯-৩৯৫)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪.৬ অন্যান্য তথ্যসূত্র

- Federal Reserve. (২০২১). *Consumer Credit - G.১৯*. Washington, D.C.: Federal Reserve.
- বিভিন্ন ব্লগ ও অনলাইন ইসলামিক লাইব্রেরি (Al-Islam.org, Sunnah.com, Islamweb.net) থেকে প্রাপ্ত হাদিস ও তথ্যসূত্র।

আসহাবে সুফ্ফা

ত্যাগ, ইলম ও
ভালোবাসার মহাকাব্য



মদিনার মসজিদের এক কোণে ছিল একটি সাধারণ ছাউনি· সুফফা।
সেই ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিছু দরিদ্র, নিঃস্ব, পথহারা মানুষ;
যারা ধন-সম্পদ নয়, চেয়েছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সান্নিধ্য।

তারা ছিলেন জ্ঞানের তৃষ্ণায় উদগ্রীব, ইবাদতে নিবেদিত,
জিহাদে অগ্রগামী এবং মানবতার প্রতি অকৃত্রিম দরদী।
তাদের ত্যাগ, সাধনা ও ভালোবাসা গড়ে দিয়েছে
ইসলামের সোনালী ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়।

এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে আসহাবে সুফফাদের জীবনকথা,
তাদের অনুপ্রেরণার উৎস এবং আমাদের জন্য তাদের
অমূল্য শিক্ষাগুলো। এটি শুধু ইতিহাস নয়,
এটি হৃদয়কে বদলে দেওয়ার আহ্বান।

“তারা পৃথিবীর কিছু চায়নি,
তাই আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন চিরস্থায়ী মর্যাদা।”